শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

‘লেজেন্ডস অব ইসলাম’

১

অনুবাদ

আম্মারুল হক

‘লেজেন্ডস অব ইসলাম’

মূল : শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল
অনুবাদ : আম্মারুল হক

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। তার কাছেই আমরা আশ্রয় চাই। তারই রহমতের আশায় আমরা ব্যাকুল রই। হাজার-কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। আল্লাহর রহমতের ফল্গুধারায় সিঞ্চিত হোক তার অনুসারী সাহাবায়ে আজমাইন রা., তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িনসহ কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারাও।

প্রিয় পাঠক, আমরা এমন এক সময় বর্তমানে পার করছি, যে সময় মানুষের ঈমান-আমল কেড়ে নেওয়ার বহুবিধ জাল আমাদের চারপাশে ফেলে রাখা হয়েছে। মানুষকে সন্দিহান করে তোলা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে। জানতে দেওয়া হচ্ছে না অথবা ভুল তথ্য পেশ করা হচ্ছে ইসলামের মহান ব্যক্তিদের নিয়ে। কিংবদন্তিদের দেখানো হচ্ছে ভিলেনরূপে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লড়াইকে দেখানো হচ্ছে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসরূপে। তাতে সহজেই প্রভাবিত হচ্ছে আজন্ম বিশ্বাস করা মুসলমানগণ। কিন্তু এ সময় আমাদের করণীয় কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। আমাদের ওপর দায়িত্ব বর্তায় ইসলামের ওপর আসা এমন আঘাতসমূহ প্রতিহত করার। কিন্তু আমরা কতটুকু তা করতে পারছি?

পাঠক, আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং প্রশান্তির বার্তা হলো, বর্তমান সময়ের তরুণ, তরুণী তথা আধুনিক জগতে বসবাস করা ইসলামপ্রিয় মানুষের কাছে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহ একটি পরিচিত মুখ ও নাম। শাইখ জিবরিল হাফিজাহুল্লাহ তার প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামের নানা দিক তুলে ধরেন। এই উম্মাহকে জাগিয়ে তুলতে তিনি পেশ করে চলেছেন তার দরদমাখা বয়ান। এই উম্মাহকে উজ্জীবিত করতে তিনি তাদের সামনে উপস্থাপন করছেন ইসলামের বীরদের কীর্তি। ইসলামের সেই মহান বীরদের সম্পর্কে তার দেওয়া

লেকচার সিরিজ 'লেজেন্ডস অব ইসলাম'। সেই লেকচার সিরিজের কজন বীরের জীবনীর প্রথম অংশের অনুবাদগ্রন্থ এটি।

এই লেকচার আমরা অনুবাদ করিয়ে প্রকাশে বেশ আগ্রহী ছিলাম। আমাদের জন্য সুখবর বয়ে নিয়ে এলেন আমাদের সকলের প্রিয়মুখ, প্রাঞ্জল লেখক ও অনুবাদক স্নেহাশিস মাওলানা আম্মারুল হক হাফিজাহুল্লাহ। ইতিমধ্যেই তিনি আরও লেকচার অনুবাদ করে সুনাম অর্জন করেছেন। তার অনুবাদ-দক্ষতা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তিনি তার সাবলীল অনুবাদে ভালোবাসা অর্জন করেছেন। এই লেকচার তথা 'লেজেন্ডস অব ইসলাম' তিনি অনুবাদ করে আমাকে দেখালে আমি তার সাবলীল অনুবাদে মুগ্ধ হয়ে প্রকাশের উদ্যোগ নিই। অবশেষে সকল কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত করার পর 'লেজেন্ডস অব ইসলাম'-এর প্রথম খণ্ড আপনাদের সামনে পেশ করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের আশা, এই জীবনী সিরিজ সকলকে আলোর পথ দেখাবে ইনশাআল্লাহ। একজন প্রকাশক হিসেবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

এই বইয়ের কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো ভুলচুক হয়, তবে সেটার জন্য সচেতন পাঠকের কাছে অনুরোধ রইল, যেন ভুল আমাদের দৃষ্টিগোচর করা হয়। আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। পরিশেষে সকলের মেহনতকে আল্লাহ কবুল করে নিন। এই বইখানা আমাদের জন্য নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

নিবেদক
বোরহান আশরাফী
২২-১০-২০২২
মাতুয়াইল, ঢাকা

ভূমিকা

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। পরম দয়ালু মহান রবের অশেষ অনুগ্রহ ও দয়া যে, শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহর লেকচার সিরিজ 'লেজেন্ড অব ইসলাম' অনূদিত হয়ে 'উম্মাহর মহানায়কেরা' নামে ছাপার অক্ষরে আমাদের হাতে পৌঁছে গেছে। আমার মতো এক নগণ্য বান্দাকে দিয়ে মহান আল্লাহ এই বিশাল কর্ম সম্পাদন করিয়েছেন, শক্তিসামর্থ্য দিয়ে পূর্ণতা দান করেছেন, এ কারণে তার প্রতি বিনয়াবনত শুকরিয়া আদায় করছি।

প্রিয় পাঠক, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সদা সমুন্নত। পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা যে রেখা যুগের পরিক্রমায় অঙ্কন করেছি, তা মুছে ফেলার সাধ্য কারও নেই। আমাদের রক্তভেজা জনপদগুলো সাক্ষী হয়ে আছে আমাদের বীরত্বের, শৌর্যবীর্যের, ন্যায় ও ইনসাফের। ধরণি দাপিয়ে বেড়িয়েছে আমাদের তেজস্বী অশ্বের খুর। তরবারির আঁচড়ে আমরা পালটে দিয়েছি জুলুমের গতিপথ। হ্যাঁ, আমরাই সেই জাতি।

তবে শুধু আমাদের তরবারিই নয়, সমান গতিতে চলেছে কলমও। ইলমের মশাল হাতে আমরা তিমিরাচ্ছন্ন হাজারো জনপদের আঁধার দূর করেছি। 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক'-এর মর্মবাণী হৃদয়ে ধারণ করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছি 'কলাল্লাহু ওয়া কলার রাসুল' উচ্চারণের আসমানি ধ্বনি। কত নাম না জানা বীর-মুজাহিদ যেমন রক্ত ঢেলেছেন এ পথে, ঠিক তেমনই কত

যে অখ্যাত শাইখ ইলমের মসনদে বসে আলো ছড়িয়েছেন হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হাতে, সে হিসেব কে রাখে! প্রকৃতপক্ষে, সকলের আলোচনা করতে গেলে এক জীবন ফুরিয়ে তৃষ্ণা রয়ে যাবে আরেক জনমের। কিন্তু তাই বলে কি আমরা সেই তৃষিত পেয়ালায় প্রবহমান সঞ্জীবনী পানের লোভ সামলাতে পারি? গোটা মুক্তোমালার চোখ ধাঁধানো চমকের ভয়ে মুদিত আঁখির অভিশাপে খণ্ডাংশের দৃশ্যরস আস্বাদন থেকেও বঞ্চিত হতে পারি? অতএব, এই সিরিজ আলোচিত হতে যাচ্ছে সেই মালার কিছু অত্যুজ্জ্বল মুক্তোর বিবরণ নিয়ে। মুসলিম 'উম্মাহর মহানায়কেরা'-এর কজন মহানায়ককেই আমরা পড়তে যাচ্ছি।

প্রিয় পাঠক, এবার আসি বইয়ের কথায়। এই বইয়ে আমরা শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহর সিরিজে আলোচিত কজনের জীবনী অনুবাদের পাশাপাশি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ.-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছি, যদিও তিনি এই লেকচার সিরিজে আলোচিত হননি। আমরা আশা করছি, এতে আপনারা অত্যন্ত উপকৃত ও আনন্দিতই হবেন।

শাইখের লেকচারের সাথে অন্যান্য জীবনীর ধারাবর্ণনার একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান, শাইখ কেবল রসহীন ধারায় ইতিহাস বর্ণনা করেই চলে যান না; বরং, তিনি আলোচ্য মহানায়কের কর্মোদীপ্ত জীবনের আলোকিত দিকগুলো বর্ণনার পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনে তার ইলম ও আমলের ছোট ছোট উদাহরণগুলোও তুলে ধরেন। এসব বর্ণনার পাশাপাশি বর্তমান সময়ের উদাহরণ টেনে আমাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে তোলেন আমলের প্রতি এবং প্রতিটি ঘটনার শিক্ষা বাস্তবতার ছাঁচে বসিয়ে উপস্থাপন করেন। ফলত, তা কেবল উপভোগ্য ইতিহাস না হয়ে ব্যক্তিজীবনে আমল প্রতিফলনেরও রোডম্যাপ হয়ে দাঁড়ায়। আর আমরা অনুবাদেও এসব দিক ফুটিয়ে তুলতে পুরোপুরি লক্ষ রেখেছি।

অনুবাদের কথা যেহেতু এসেছে, তো সে বিষয়েও কিছু বলা যাক—

পাঠক, ইতিহাস পড়া কষ্টসাধ্য। কিন্তু তা যদি ঝরঝরে হয় তবে সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। সে লক্ষ্যে অনুবাদে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে কাঠিন্য এড়িয়ে সহজ-সাবলীল ধারাবর্ণনায় একে সুখপাঠ্য করে তোলার। লেকচারে যা ছিল শ্রোতার উদ্দেশে কথা ও ভাষণ, তাকে এখানে পাঠকের জন্য পাঠ্যরূপ দেওয়া হয়েছে, সম্বোধনকে পরিণত করা হয়েছে ভাববাচ্যে, মধ্যমপুরুষ স্থান পেয়েছে

নামপুরুষে। মোদ্দাকথা, দীর্ঘ ক্লান্তিকর অনুভূতির পরিবর্তে তৃষ্ণা বৃদ্ধির উপাদানের সমারোহ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেন পাঠক তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। এ ছাড়াও টীকায় প্রতিটি আয়াত ও হাদিসের নম্বর উল্লেখের পাশাপাশি অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর রেফারেন্স সংযোজন করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে, লেকচারগুলোর পরে প্রশ্নোত্তরপর্বের যে-সকল প্রশ্ন আলোচ্য মহানায়ককেন্দ্রিক ছিল, তা অনুবাদের মধ্যেই যোগ করে দেওয়া হয়েছে, লেকচার থেকে কোনোকিছু বিয়োজন করা হয়নি, বরং আলোচনার ধারাবাহিকতায় ছুটে যাওয়া অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণতা দিতে করা হয়েছে নির্ভরযোগ্য নানা সংযোজন। যার ফলে এই অনুবাদগ্রন্থটি পুরো লেকচার সিরিজের একটি পরিমার্জিত রূপ পেয়েছে।

পাঠক, দীর্ঘ সময়ের নিমীলিত আঁখিদ্বয়ের এই যাত্রাপথে ভুলত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। সর্বোচ্চ চেষ্টার পরেও মানুষের মনুষ্যত্বের প্রমাণস্বরূপ আমাদের ভুল রয়ে যায়। তদুপরি অযোগ্যতার ভার মাথায় নিয়ে এই অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছি। সুতরাং, আমাদের দুর্বলতাগুলো যোগ্য ও সতর্কদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর, তা আমাদের জানা। তাই কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আপনাদের কল্যাণকামী হৃদয়ের কাছে অনুরোধ রইল আমাদেরকে তা অবগত করার, নিশ্চয় বিবেচনাপূর্বক আমরা তা শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট আর্জি জানিয়ে শেষ করছি, প্রকাশক, প্রুফরিডারসহ এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন, সকলের পরিশ্রম কবুল করুন, এবং আমাদের জন্য এই বইকে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

—আম্মারুল হক
০৩-০৬-২০২২ খ্রি.
কল্পলোক আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

আকসা বিজয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা :

বীর সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ.

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (১)، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (২)، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(৩)

১. হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।[১]

২. হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি

১. সুরা আলে-ইমরান : ১০২

তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে, এবং তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, আর উভয়ের থেকে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নরনারী। ভয় করো সেই আল্লাহকে, যার অসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করাকে) ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পর্যবেক্ষণ করছেন।[২]

৩. হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তা হলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করবেন আর তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে সে মহাসাফল্য লাভ করে।[৩]

আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। বিশেষ করে যারা দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন। অনেক ভাই আছেন যারা ডেট্রয়েট থেকে এসেছেন। বিশেষ করে আমি ওই সকল ভাইয়ের কষ্ট-পরিশ্রমকে মূল্যায়ন করতে চাই, যারা সুদূর উইনস্টার থেকে গাড়ি চালিয়ে এখানে এসেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতিটি কদমে নেকি দান করুন। এ ছাড়া তিনি সে সকল ভাইকেও উত্তম বিনিময় দান করুন, যারা এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এবং তা প্রচার-প্রসার করেছেন। জাজাকুমুল্লাহ খাইর।

আজ আমরা যে সিরিজ শুরু করছি তা ইনশাআল্লাহ এই ছুটিতেই শেষ করব। আমরা যারা নানান গুনাহে লিপ্ত, তারা সকলেই এখানে এসেছি আমাদের সেসব গুনাহ মাফ করানোর জন্য। অমুসলিমরা যেমন এই ছুটিটা আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ কাজ উদযাপনের মাধ্যমে ব্যয় করছে, ঠিক বিপরীতে গিয়ে আমরা এই ছুটিতে এখানে একত্র হয়েছি আমাদের গুনাহগুলো সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য। মূলত সত্যিকার মুমিনগণ এমনই হয়। ফেরেশতারা আপনাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছে। গর্তের পিঁপড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের তিমি মাছ পর্যন্ত আপনাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছে। কারণ আপনারা এখানে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, শুধুই ইসলামকে জানার জন্য এসেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আজ এখানে যেমন আমরা

---

২. সুরা নিসা : ১

৩. সুরা আহজাব : ৭০, ৭১

একত্র হয়েছি, এমনইভাবে আমরা যেন কেয়ামতের দিনেও একত্র হতে পারি। বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে যেন আমরা মিলিত হতে পারি। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

আমাদের আজকের আলোচনা হলো, 'হিরোজ অব ইসলাম' সিরিজের প্রথম পর্ব নিয়ে। একে আপনারা 'ম্যান উইদ লিগেসিস' সিরিজও বলতে পারেন। কিছুদিন আগে আমরা 'উইমেন উইদ লিগেসিস' নামে একটি সিরিজের আয়োজন করেছিলাম। অনেক ভাই এতে নাখোশ হয়ে সেখানে উপস্থিত হননি। তাই আমাদের এবারের আয়োজন 'ম্যান উইদ লিগেসিস'। এ আয়োজন পুরুষদের নিয়ে। অতএব, আপনারা এই আলোচনা শোনার সুযোগ পাবেন ইনশাআল্লাহ।

এক ব্যক্তির কথা আমি সবার আগে আলোচনার কথা ভেবেছিলাম, তবে তিনি আমাদের আজকের আলোচ্য ব্যক্তি নন। কারণ আমি তাকে নিয়ে যখন পড়াশোনা করছিলাম তখন এই ব্যক্তির নাম চলে এলো, যার জীবনী আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তবে যার কথা আমি আগামীকাল আলোচনা করব, তাকে নিয়ে আমি পড়াশোনা করছিলাম, এর মাঝে তার শিক্ষকের নাম এলো। আমি দেখলাম তার শিক্ষক তার চেয়ে গুণেমানে অগ্রগণ্য ছিলেন, ফলে আমি তাকে আজকের আলোচনার জন্য বেছে নিলাম। এর পেছনে বিশেষ একটি কারণও আছে বটে। কারণ উম্মাহর বর্তমান অবস্থা লক্ষ করে দেখলাম, বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকে ইরাকে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে নির্মূল করা হচ্ছে। আমাদের ভাইদেরকে ফিলিস্তিনে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। দিন দিন তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কাশ্মীর, তুর্কিস্তান বা জিনজিয়াংসহ বিশ্বের অনেক জায়গায় মুসলিম উম্মাহ আক্রান্ত। একটা সময় ছিল, যখন বিশ্বের কোনো স্থানে মুসলমানরা নির্যাতিত হলে আমাদের নেতারা পদক্ষেপ নিতেন। তারা বলতেন, আমরা এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ আছি। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন এক সময় অতিবাহিত করছি, যেখানে আমাদের তেমন কোনো শক্তিশালী নেতা নেই। বর্তমানে মুসলিম নেতারা সুপার পাওয়ারদের অনুগত হয়ে আছে এবং তারা যা বলে তা-ই শোনে। আমি আমাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলাম, এবং ভাবলাম, নিশ্চয়ই এমন সময় আগেও গিয়েছিল, যে সময়টা বর্তমানে আমরা অতিবাহিত করছি।

অনেকেই ভাবতে পারেন, এই সিরিজে হয়তো বেশিরভাগ আলোচনা

সাহাবিদের নিয়ে হবে। তা কিন্তু নয়। আমি সাহাবিদের সম্পর্কে কোনোকিছু বলতে চাই না। তার মানে এই নয় যে, আমরা তাদেরকে ভালোবাসি না। বরং আমি দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে বেহেশতে তাদের সাথে একত্র করেন। আমরা তাদের সম্পর্কে কোনোকিছু বলার চেয়েও তারা বহু ঊর্ধ্বে। আমি তাদের কারও কারও নাম আজ উল্লেখ করব। তো কিছু কিছু মানুষ মনে করে, সাহাবিরা ভিন্ন জগতের কেউ ছিলেন। তারা ছিলেন অজেয়, কারণ তারা তো ভিন্ন কেউ। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছেন। আবার স্বয়ং তিনিও সাহাবিদের দলেরই একজন ছিলেন। এমনকি আমরা যখন তাদের মাথা থেকে এ ধারণা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি, তবুও তাদের মাথায় এটাই বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, সাহাবিরা এ কাজ করতে পেরেছেন, যেহেতু তাদের মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। অন্যথায় কী করে মুসআব বিন উমাইর রা. এটা করতে পেরেছেন, আবু বকর রা. ওটা করতে পেরেছেন! ইত্যাদি ইত্যাদি... এটাই তাদের মাথায় গেঁথে থাকে। তাই আজ আমি এমন একজন ব্যক্তির কথা আলোচনা করব, যিনি সাহাবিও ছিলেন না, তাবেয়িও ছিলেন না। উল্লেখ্য, সাহাবিদের পরের যুগের ব্যক্তিবর্গকে তাবেয়ি বলা হয়, আর তাদের পরের যুগের ব্যক্তিবর্গকে তাবে তাবেয়ি বলা হয়। তো আজকের আলোচ্য ব্যক্তি তাবে তাবেয়িও ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইতিহাসের মাঝামাঝি সময়ের একজন। তিনি আর কেউ নন, সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ.। আজ আমাদের আলোচনা হবে তাকে কেন্দ্র করে।

যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ.-কে নিয়ে আলোচনার পূর্বে একটা বিষয় বলে রাখতে চাই, এই সিরিজে কেবল জিহাদ ও যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করা মুজাহিদদের নিয়েই আলোচনা করব না, বরং এখানে আমরা ইসলামের সে সমস্ত যোদ্ধার কথাও তুলে ধরব, যারা ইলমের ময়দান দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, ইসলামি আকিদাবিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসের যে মহানায়ককে নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব, তার মাঝে দুটো গুণই উপস্থিত ছিল। আজ তার আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সকলে তার মতো হওয়ার চেষ্টা করব, যেন মুসলিম উম্মাহকে এই দুঃসময় থেকে

উদ্ধার করতে পারি।

একটি কবিতা দিয়ে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক নামে একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুজাহিদ ছিলেন। তিনি প্রায় সময় যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন, এক যুদ্ধের ময়দান থেকে আরেক যুদ্ধের ময়দানে ছুটে বেড়াতেন। তো তার এক বন্ধু ছিল ফুজাইল ইবনে ইয়াজ নামে। তিনি ছিলেন একজন ইবাদতগুজার লোক। মুজাহিদও ছিলেন, কিন্তু প্রায় সময়ই ইবাদতে কাটাতেন। এজন্য তাকে 'আবিদুল হারামাইন' বলা হতো। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ সময় যুদ্ধের ময়দানে কাটাতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. একবার যুদ্ধের ময়দান থেকে তার বন্ধু ফুজাইল ইবনে ইয়াজের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন, চিঠিতে লেখা ছিল—

يا عابدَ الحرمين لو أبصرْتَـنا .. لعلمتَ أنَّكَ في العبادةِ تلعبُ

مَنْ كانَ يخضبُ خدَّه بدموعِه .. فنحورنُـا بدمـائِنا تَتَخَضَّبُ

أَوَكان يتعبُ خيله في بـاطل .. فخيـولنا يوم الصبيحة تتعبُ

ريحُ العبيرِ لكم ونحنُ عبـيرُنا .. رَهَجُ السنابكِ والغبارُ الأطيبُ

ولقد أتـانا مـن مقالِ نبيِّنا .. قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يَكـذبُ

لا يستوي غبـارُ أهلِ الله في .. أنفِ أمرئٍ ودخانُ نارٍ تَلهبُ

هذا كتابُ الله ينـطقُ بيننا .. ليسَ الشهيدُ بميـتٍ لا يكـذبُ

হে হারামাইনের ইবাদতকারী, যদি আমাদের ইবাদত দেখতে,
ইবাদতের ক্রীড়ায় ডুবে আছ তুমি, নিশ্চয় বুঝতে!
কেউ তার গাল ভেজায় চোখের অশ্রুতে,
আর আমাদের সিনা রঞ্জিত হয় রক্তের প্লাবনে!
কেউ অযথা কাজে তার ঘোড়াকে ক্লান্ত করে,
আমাদের ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত হয় যুদ্ধের সকালে।
তোমাদের জন্য রয়েছে আবিরের সুবাস, আর আমাদের আবির হলো,
ঘোড়ার খুরের আঘাতে উত্থিত ধূলি আর সুবাসিত ধূলিকণা।
আমাদের কাছে আমাদের নবীর বাণী পৌঁছেছে,

সত্য, সঠিক, অভ্রান্ত সে বাণী বলে—
আল্লাহর বাহিনীর পথের ধূলি ও প্রজ্বলিত জাহান্নামের ধোঁয়া
কখনো একই ব্যক্তির নাসারন্ধ্রে একত্র হবে না।
এই যে আরও আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে অভ্রান্ত বাণী শোনায়—
আল্লাহর পথের শহিদ কখনো মৃত নয়।

আবু আবস রা. হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّار.

আল্লাহর পথে যে বান্দার পদদ্বয় ধূলিধূসরিত হয়েছে, জাহান্নামের আগুন তা স্পর্শ করবে না।[৪]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ .

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা কখনোই তাদের মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত।[৫]

এই কবিতা দেখে ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. কাঁদতে শুরু করেন। বস্তুত তিনি জানতেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. যা বলছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। তারা যুদ্ধের ময়দানে ধুলোবালির সুঘ্রাণ পান, উট ও ঘোড়ার পা থেকে উড়ে আসা ধুলোবালি তাদের মুখ ঢেকে দেয়। আর আমরা এখানে আমাদের পরিবারের সাথে আনন্দের দিন কাটাই। অথচ তারা তাদের ঘোড়া দাপিয়ে বেড়ায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকাকে উড্ডীন করতে। আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে কত পার্থক্য!

তো আজ আমরা যাকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তার নাম নুরুদ্দিন

৪. *সহিহ বুখারি*, ২৮১১।
৫. সুরা আলে-ইমরান : ১৬৯।

মাহমুদ। তার পিতা ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকি। যে কারণে আমি সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ.-কে বেছে নিয়েছি, তা হলো, তিনি তার সময়ে ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করছিলেন, রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, পাশাপাশি তাকে লড়তে হয়েছে তার মুনাফিক আমিরদের সাথে। বর্তমানে আমাদের যেমন অবস্থা, ঠিক তা। তখনকার সময়ের মুনাফিক আমিররা নিজেদের মুসলিম ভূমি ক্রুসেডারদের এবং রোমান সম্রাটদের ব্যবহার করতে দিত, যেন তারা তাদেরকে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করে, অথবা যেন তারা ক্ষুদ্র জায়গির হলেও তাদেরকে দান করে। আমাদের সময়েও চলছে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড যুদ্ধ। তখনকার দিনে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-কে মুসলিম মুনাফিকদের সাথে লড়তে হয়েছে, পাশাপাশি তার সময়ে আরও ছিল ফাতেমি শিয়ারা, যারা তাদের শয়তানি বুদ্ধি ও ভ্রান্ত বিশ্বাস মুসলিম সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এমনকি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল মিশরে। এটি তখনকার সময়ের কথা, যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ৫১১ বছর হয়ে গেছে।

চিত্র : আধুনিক হালাব, বর্তমান আলেপ্পো

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তার পিতা ছিলেন

হালাব বা আলেপ্পোর গভর্নর। হালাব শহরটি আয়তনে ক্ষুদ্র। বর্তমান ডারবান শহরের চেয়েও ক্ষুদ্র। আজ আমাদের ২৬টি আরব দেশ এবং ৩৬টি মুসলিম দেশ আছে। এগুলো খুব বেশি নয়। মোটকথা আমাদের এর চেয়েও বেশি ভূমি ছিল। কিন্তু তাদের সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলো বিভিন্ন মুসলিম আমিরদের মাঝে ভাগ ভাগ হয়ে থাকত।

কবি কতই-না সুন্দর করে বলেছেন,

أسماء مملكة في غير موضعها

كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد

অনুপযুক্ত স্থানে সাম্রাজ্য নামের দাবি করা,
এ যেন বিড়ালের গলায় সিংহের গর্জনের মতো।

কারণ তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, তাদের এসব ক্ষুদ্র জায়গিরের অধিপতি আমিরদের নাম যখন উচ্চারণ করা হতো, তখন নামের শুরুতে সাত থেকে আট লাইন উপাধি ব্যবহার করা হতো। যেমন, 'আস সুলতান আল-মালিক আল-খলিফা' ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যেত, তাদের রাজত্ব কয়েকটি গলির মধ্যে সীমাবদ্ধ মাত্র!

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির পিতা ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন হালাবের গভর্নর। তিনি খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। বহু চেষ্টা করেছিলেন তাদেরকে থামাতে, যদিও তাতে সক্ষম হননি। তাই তিনি তার পুত্র নুরুদ্দিন জিনকিকে খুব ভালোভাবে বড় করলেন। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, একজন বীরই আরেকজন বীর গড়ে তুলতে পারে, আর একজন ভীতুর হাতে আরেকজন ভীতুই তৈরি হয়। ভিন্ন উদাহরণ থাকতে পারে বটে, তবে এটাই বাস্তব সত্য। তো বীর ইমাদুদ্দিন তার পুত্রকে ভালোভাবে লালনপালন করলেন।

প্রিয় পাঠক, একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই, এই যে আমরা ইসলামের বীরদের কথা আলোচনা করছি, তা কেবল শোনার বা পড়ার জন্য নয়। এজন্য নয় যে, আমরা এ আলোচনা শুনে বলব, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আমাদের ইতিহাস উপভোগ করলাম।' ঘটনাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, যেন আমরা এ সকল ঘটনা আমাদের নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। আমাদের মধ্য

থেকে যেন আরেকজন নুরুদ্দিন গড়ে ওঠে। আমাদের সকলেই যেন নিজেদের ঘরে নুরুদ্দিন হই, নিজেদের সমাজে নুরুদ্দিন হই, আমরা যেন নুরুদ্দিনের মতো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা এই ভূমিতে উত্তোলন করতে পারি। মূলত এজন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে এসে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। হ্যাঁ, শিক্ষাদীক্ষা খুবই প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর জমিনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা প্রতিষ্ঠা করা এবং তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া।

তো নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-কে তার পিতা সঠিকভাবে লালনপালন করে গড়ে তুললেন। এ ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটি তিনি করেছিলেন, তা হলো তাকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। এই যে আমরা ফিকহ, তাওহিদ, তাফসির এবং আরও যে-সকল বিষয়ের ইলমি মজলিস করি, সেসবের উদ্দেশ্য হলো, যেন আমরা নুরুদ্দিন হয়ে উঠতে পারি। নুরুদ্দিন যদি হতে নাও পারি, তবে যেন অন্তত আমাদের সন্তানকে নুরুদ্দিন বানাতে পারি। এটাই আমাদের লক্ষ্য, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা হয়তো এক সপ্তাহে দশটা-বারোটা ইলমি হালকা তৈরি করতে পারব না, যা নুরুদ্দিন, তার ভাইয়েরা এবং তাদের মতো আরও যারা ছিলেন, তারা করতেন এবং তারা এর মাধ্যমে তাদের ভূমিতে ইসলামের বিজয় আনার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন। ইলমে-আমলে এগিয়ে গেছেন।

যাই হোক, আজ আমরা যার কথা আলোচনা করছি অর্থাৎ সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. ছিলেন পাঁচ খলিফা তথা আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রা. এবং উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর পরে ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। বলা হয়ে থাকে, প্রথম পাঁচজন দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার ৪৫০ বছর পরেও তিনি একজন সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ কথা ঐতিহাসিক ইবনে আসিরের। তিনি তার ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন, প্রথম পাঁচ খলিফার পর দীর্ঘ ৪৫০ বছর বিরতির মধ্যে তাদের মতো আর কেউ আসেনি। এরপর নুরুদ্দিন জিনকি রহ. এলেন। তার পিতা তাকে সেভাবে বড় করেছেন। তিনি প্রথমে কুরআন, তাফসির, তাওহিদ, আকিদাসহ অন্যান্য বুনিয়াদি ইলম হাসিল করেন। তবে তার মধ্যে শুধু ইলম ছিল না, তিনি সুন্নাহরও অনুসরণ করতেন। সেটার উদাহরণ আমরা সামনে পাব।

মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশে মেঘের ঘনঘটা

তার পিতা ইমাদুদ্দিনকে কিছু ক্রীতদাস বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করে ফেলার পর তিনি ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন। দেখুন, তার পিতাকে হত্যা করেছিল নিজেরই ক্রীতদাস; তাকে কিন্তু ক্রুসেডাররা হত্যা করেনি, রোমানরাও হত্যা করেনি; বরং তারই খেয়ে-পরে ও তার আশ্রয়ে থাকা ক্রীতদাসের হাতে তার জীবন দিতে হয়েছে। বস্তুত মুসলমানদের জন্য সবসময় সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল ঘরের লোকেরাই। মুনাফিকরাই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সবসময় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ইমাদুদ্দিন নিহত হওয়ার পর সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. ক্ষমতায় বসলেন। তখনকার দিনে বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল ক্রুসেডারদের অধীনে। একদিকে রোমানরা মুসলমানদের খেলাফতব্যবস্থা আব্বাসি খেলাফত ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, ওদিকে ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত মুসলমানদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। বর্তমানে যেমন বাইতুল মুকাদ্দাসের আশেপাশে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তখনও তা-ই করা হচ্ছিল। বর্তমানে ইহুদিরা ঠিক যা করছে। কিন্তু আব্বাসি খেলাফত ছিল মৃতপ্রায়। খেলাফতের কোনো শক্তি-সক্ষমতা ছিল না বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করার। ঠিক সে সময়ে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. ক্ষমতায় আরোহণ করেন। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই তিনি কী করলেন? আমরা হলে কী করতাম? স্বাভাবিকভাবেই ফিলিস্তিনের পথে রওয়ানা দিতাম, প্রথম কাজ সেটাই করতাম।

আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, তারা আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করেও থাকেন যে, আমরা তো মসজিদুল আকসার ইতিহাস সম্পর্কে অনেককিছু শুনেছি, বিভিন্ন পত্রিকায় এসেছে কীভাবে ফিলিস্তিন ইহুদিদের অন্তর্গত, কীভাবে ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদিদের দেওয়া হয়েছে এবং তা মুসলমানদের নয়। আপনি কি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, এটি আমাদের ভূমি বা অন্যকিছু হওয়ার কথা?

এই প্রশ্নের মৌলিক এবং সহজ উত্তর হলো, আমি যদি কোনো বাড়ি কিনে থাকি বা আমি কোনো বাড়ি বানিয়ে থাকি, তাহলে এটা কার? এটা কার অন্তর্গত? অবশ্যই এটা আমার, এটা আমারই। এবার বলুন আকসা নির্মাণকারী কে? আদম আ. আকসা নির্মাণ করেছেন।

চিত্র : প্রাণের আকসা

আদমকে মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই মসজিদ তৈরি করেছিলেন, এবং একের পর এক আল্লাহর রাসুলগণের (ইয়াহইয়া ও ঈসা তাদের মধ্যে অন্যতম) মিশন ছিল আকসার ভূমি মুক্ত করা। নবীগণের নিজস্ব মিশনের মধ্যে ছিল আকসাকে মুক্ত করা। তাহলে আমরা কেন এটাকে আমাদের মনে করব না? এটা তো আমাদের নবী আদম আ. নির্মাণ করেছেন। আমি মনে করি না যে, কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে। আপনি যদি ইহুদিদের আল্লাহকে দেওয়া মিসাক তথা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে চিন্তা করা শুরু করেন তবে আমি বলব, যে-কেউ আদমের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তার ফিলিস্তিনের অধিকার রয়েছে। এখন যারা সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তারা তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

উম্মাহর জন্য বুকভরা দরদ

প্রিয় পাঠক, সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর অন্তরে ছিল ইলমের প্রতি ভালোবাসা, বিশুদ্ধ ইলমের প্রতি অনুরাগ। তিনি বিদ্যমান সব ধরনের ধোঁয়াশা, বিভ্রান্তি ও বাতিলচর্চা দূর করতে চাইলেন। এ কারণে তিনি প্রথমে ক্ষমতায় এসেই শিয়াদের সাথে দফারফা করলেন। শিয়ারা তাদের আজানে 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' বলত। তিনি এসে এই নিয়ম রহিত করে দিলেন। আমাদের চোখে এটা হয়তো খুব ক্ষুদ্র জিনিস হতে পারে, কিন্তু

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর কাছে তা ক্ষুদ্র জিনিস ছিল না। হয়তো মনে হতে পারে, সে মুহূর্তে ফিলিস্তিনে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছিল, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু বাস্তব কথা হলো, ইসলামে সবই গুরুত্বপূর্ণ। তার শিক্ষকরা এটাই তাকে শিখিয়েছিলেন যে, ইসলামে কোনো বিধান কোনোটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হ্যাঁ, কখনো কখনো প্রয়োজনসাপেক্ষে কোনো কোনো বিধানকে অপর বিধানের আগে বাস্তবায়ন করতে হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তা অন্যটির গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে। তো সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. ক্ষমতায় আসার পরপরই 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' রেখে 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' বাক্যের ব্যবহার দূর করে দেন। বস্তুত তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পদ্ধতি ভালোবেসেছেন, তাই আজানের এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে তার সুরাহা করেছেন।

তিনি কখনো বেহুদা ও বাজে লোকদের সাথে মিশতেন না। তাকে সর্বদা মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও আলেমদের সাথে দেখা যেত। তাদের সাথে তিনি হাদিস, ফিকহ, শরিয়া নিয়ে আলোচনা করতেন, এর বাইরে অন্য কোনো কথা বলতেন না। তিনি এবং তার সহচররা একত্র হলে এসব নিয়েই কথা বলতেন, অন্য কোনো কথা বলে সময় নষ্ট করতেন না। কারণ তিনি ইলম ভালোবাসতেন। তিনি আড্ডাবাজি করতেন না, কারও গিবত করতেন না। একবার মুহাদ্দিসগণ তাকে একটি হাদিস বললেন। উক্ত হাদিসের শেষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসেছিলেন। তাই উক্ত হাদিস বলার পর মুচকি হাসা সুন্নাতে পরিণত হলো। যখনই মুহাদ্দিসগণ হাদিসটি বলেন তখনই তারা মুচকি হাসেন। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তারাও মুচকি হাসে। মূলত এটি এ কারণে সুন্নাহ যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুচকি হাসার পেছনে নিঃসন্দেহে কোনো কারণ ছিল। কিন্তু সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর সামনে যখন হাদিসটি বলা হলো, তিনি মুচকি হাসলেন না। সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, আপনি সুন্নাহকে এত বেশি ভালোবাসেন, কিন্তু এই হাদিস শোনার পরে আপনি কেন মুচকি হাসছেন না? কীভাবে আপনার হাসি এলো না? উত্তরে তিনি বললেন, কীভাবে আমি হাসতে পারি, যেখানে মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে! মুসলিমদের ভূমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে! এবং তারা সব জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি কীভাবে হাসতে পারি? আল্লাহ তাআলা যদি

কেয়ামতের দিন আমাকে প্রশ্ন করেন, উম্মাহর এই দুর্দিনে আমি কীভাবে হাসলাম? তখন আমি কী উত্তর দেবো?

দেখুন, সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. এত বেশি সুন্নতের অনুসরণ করতেন, তবুও তিনি হাসেননি, তার মুখে হাসি ফোটেনি। সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমনকি মানুষেরা এ কথাও বলেছে, নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-কে তার সমগ্র জীবনে খুব কমই হাসতে দেখা গিয়েছে।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. ৫৮ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আমাদের পিতা-পিতামহরা ৮০ বছরের চেয়েও বেশি হায়াত পায় বটে, কিন্তু মহান আল্লাহর কসম করে বলছি! সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. তার ৫৮ বছরের জীবনে যা করেছেন, আমাদের পিতা ও পিতামহরা তার একভাগ তো দূরের কথা, এক ভাগের এক শতাংশও করতে পারে না! সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছেন লাগাতার ২৮ বছর। হ্যাঁ, দিনের পর দিন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছেন, যার মেয়াদকাল ছিল সুদীর্ঘ ২৮ বছর! উল্লেখ্য, ৫১১ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন আর ৫৬৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. হাসেননি, উম্মাহর দুর্দিনে তার মুখে হাসি ফোটেনি। অথচ আমরা ঠিকই হাসি! কীভাবে আমাদের হাসি পায় বলুন, যেখানে মুসলমানরা বিশ্বের সর্বত্র নির্যাতিত হচ্ছে! প্রতিদিন আক্রমণ করে করে তাদের ঘরবাড়ি ধসিয়ে দেওয়া হচ্ছে! ফিলিস্তিনে মানুষসমেত বোমা মেরে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! আমার (অর্থাৎ, শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের) কাছে প্রতিদিনই বিভিন্ন চিঠি আসে। তার মধ্যে গতকাল একটি চিঠি এসেছে, যা আমাদের চেচনিয়ার ভাইয়েরা লিখেছেন। তারা শীতে কষ্ট পাচ্ছেন। শীত নিবারণ করার মতো কিছুই তাদের কাছে নেই। কিন্তু এই যে আপনারা এখানে বসে আছেন, আপনাদের সবার গায়েই জ্যাকেট, সবার পায়ে মোজা। প্রচণ্ড শীত পড়লে আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আগুনের তাপ নিয়ে উষ্ণতা অনুভব করি। কিন্তু চেচনিয়ার ভাইদের কাছে কোনো জ্যাকেট-মোজা তো দূরের কথা! তারা ভিক্ষা করছে, আল্লাহর কসম! তারা ভিক্ষা করছে! তাদের কাছে খাওয়ার মতো কিছু নেই। আমার ভাইয়েরা! আমরা কীভাবে এত হাসিঠাট্টায় মজে আছি, যেখানে তাদের থাকার জন্য ঘরটুকু পর্যন্ত নেই! তাদের মাথার ওপর আকাশ ছাড়া কোনো ছাদ নেই! অথচ তারা আমাদেরই ভাই!

উম্মাহর এই পরিস্থিতিই সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর অন্তরকে কাঁপিয়ে

দিয়েছিল। তাই তিনি সুন্নতের প্রতি এত কঠোর হওয়া সত্ত্বেও হাসতে পারেননি। আর তিনি সুন্নতের ব্যাপারে কতটা কঠোর ছিলেন, তা নানা ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

সুন্নাহর প্রতি অনুরাগ

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. একবার শুনলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বিশেষ পদ্ধতিতে তলোয়ার ধারণ করতেন। কিন্তু নুরুদ্দিন জিনকি রহ. যেভাবে তলোয়ার রাখতেন তা আল্লাহর রাসুলের মতো ছিল না। তিনি আল্লাহর রাসুলের তলোয়ার রাখার পদ্ধতিটি এক ঘরোয়া মজলিসে শুনতে পেলেন। এবং এও জানলেন যে, এটি একটি সুন্নাহ। তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, কে বলেছে এটি স্রেফ একটি সুন্নাহ? আল্লাহর রাসুলের কাজ এটি। এটি তো স্বতন্ত্র ইবাদত।

দেখুন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকলে তিনি আল্লাহর রাসুলের সুন্নাহকে ধারণ করা ইবাদত মনে করতে পারেন। এটা ভালোবাসার আতিশয্য। তিনি আল্লাহর রাসুলের তলোয়ার রাখার পদ্ধতি শুনে সাথে সাথে নিজের তলোয়ার সেভাবে পরিবর্তন করে নিলেন এবং সমগ্র সেনাবাহিনীকে সেভাবে তলোয়ার রাখার আদেশ দিলেন। দেখুন, একটা ছোট্ট সুন্নাহকে তিনি কত গভীরভাবে ভালোবেসেছেন!

এ ছাড়াও তিনি ছোট ছোট সুন্নাহকে অন্তরে ধারণ করতেন। পাশাপাশি তিনি গভীর ইলম রাখতেন। যেমন তিনি 'হাইয়া আলাল ফালাহ' ও 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল'-সংক্রান্ত বিষয়ে শিয়াদের সাথে দফারফা করেছেন। কারণ তিনি একে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নিয়েছেন। তার পিতা তাকে ছোটবেলা থেকে ইলম শিখিয়ে বড় করেছেন এবং তাকে এমন এক বীর সন্তানে পরিণত করেছেন যে, পরবর্তী এক হাজার বছরে তেমন আর কাউকে দেখা যায়নি! আমি নিজে (অর্থাৎ, শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল) এক হাজার বছরের ইতিহাস পড়েছি, কিন্তু তার মতো কাউকে পাইনি। কেবল তার শিষ্যকে পেয়েছি। তার শিষ্যের কথাও আমরা জানব। তবেই আমরা বুঝতে পারব, বীরই কেবল বীর গড়ে তুলতে পারে।

তার শিষ্য ছিলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ইতিহাসসংক্রান্ত

বইগুলোতে তার শিক্ষক সম্পর্কে জানা যায়। সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকিই ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির শিক্ষক। কিন্তু তাকে খুব কম লোকই চেনে। অথচ তিনি এই উম্মাহর একজন মহানায়ক। তিনি এমন এক ব্যক্তি, যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

অমর বীরের অজেয় বীরত্ব

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. ছিলেন মহান বীর। এবার তার বীরত্বের কথা শুনুন।

সাধারণত, কমান্ডারদের লড়াই করতে হয় না। তারা অন্যদের নির্দেশ দিয়ে পেছনে থেকে পর্যবেক্ষণ করে কেবল। কিন্তু সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি এমন সেনাপতি ছিলেন না। প্রতিবারই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সামনের সারিতে ছিলেন। বস্তুত তার পিতা যখন তাকে ইলম শেখান, তখন শুধু ইলমই শেখাননি, তাকে সামরিক বিদ্যাও শিক্ষা দিয়েছিলেন। দৈহিক শক্তিতেও তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি শারীরিকভাবে এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, নিজের সমভারের দুটি বস্তু বহন করতে পারতেন। যদি অন্যরা দুটি ব্যাগ বহন করত, তবে তিনি চারটি ব্যাগ বহন করতেন। যদি তারা চারটি বহন করত, তবে তিনি আটটি বহন করতেন। তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তির দ্বিগুণ বহন করতে পারতেন। তিনি অন্যদের কাজে লাগিয়ে নিজে বসে থাকার মতো নেতা ছিলেন না।

একবার তার সঙ্গীসাথিরা তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করল, সুলতান, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, তারা (শত্রুরা) আমাকে অনেকবার হত্যাচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। তার মানে আল্লাহ আমাকে পছন্দ করেন না, তাই তো তিনি আমাকে শহিদ হিসেবে বেছে নেননি!

প্রিয় পাঠক, দেখুন, তার পিতা তাকে কীভাবে মানুষ করেছেন! কী ভিতের ওপর তাকে দাঁড় করিয়েছেন!

যেমন একবার সঙ্গীরা যখন তাকে বলল, সুলতান, আমাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে আপনার লড়াই করা উচিত নয়। কারণ আপনি জানেন যে, যদি তারা আপনাকে হত্যা করে তবে তা এই উম্মাহর জন্য বিরাট পরাজয় ও ক্ষতির কারণ হবে। পক্ষান্তরে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হলেও তেমন কিছু হবে না, কিন্তু আপনাকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারব না। তখন তিনি তাদের দিকে

তাকিয়ে (তিনি তার চারপাশে আলেমদের সঙ্গী হিসেবে রাখতেন) বললেন, আপনারা কি আল্লাহর ওয়াদা কী তা জানেন না, আল্লাহর ব্যাপারে আপনাদের ধারণা কেমন? তারা বললেন, সুলতান এ কী বলছেন! তখন সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি বললেন, কে নুরুদ্দিন! আল্লাহ ছাড়া নুরুদ্দিন কীভাবে ইসলামকে রক্ষা করবে? আর আল্লাহ নুরুদ্দিনকে ছাড়াই ইসলামকে রক্ষা করবেন! নুরুদ্দিন কিছুই না!

দেখুন, তিনি আল্লাহর সামনে কতটা বিনয়ী ছিলেন।

অকুতোভয় সুলতান

যুদ্ধের ময়দানে তার শক্তি ছিল বর্শা এবং ঘোড়া। তখনকার যুদ্ধগুলোতে সমগ্র বাহিনীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হতো—ডান, বাম, মধ্য, সম্মুখ ও পেছন সারি। যুদ্ধগুলো হতো দুর্গকেন্দ্রিক। কোনো শহর বা দেশ জয় করতে হলে সেখানকার দুর্গ অবরোধ করে পতন ঘটিয়ে জয় করতে হতো। দুর্গের অভ্যন্তরে দুর্গরক্ষী সৈনিক থাকত। দুর্গের থাকত উঁচু উঁচু দেয়াল। এটাই ছিল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভাঙতে হতো তিরধনুক কিংবা মিনজানিক দিয়ে পাথর ও আগুনের গোলা বর্ষণ করে। কখনো কখনো মুসলমানরা দুর্গে অবস্থান করত। আর কাফেররা তাদেরকে একইভাবে আক্রমণ করত।

লেবাননের তারাবলুস শহরে এমনই এক যুদ্ধে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি এতটাই সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন যে, তার তরবারির ঘূর্ণির সামনে কেউ টিকতে পারছিল না। তবে সেই যুদ্ধে মুসলমানদের পিছু হটতে হয়। সুলতান হালাবে তার ভূমিতে ফিরে গেলেন। এরপর পুনরায় শক্তি সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি দুর্গের সামনে এমন জায়গায় অবস্থান নিলেন যেখানে শত্রুরা তাকে সহজেই হত্যা করতে পারবে। তা দেখে তার সঙ্গীসাথিরা বলে উঠল, সুলতান! আপনি এখানে দাঁড়াবেন না। আপনার কিছু হয়ে গেলে আমাদের কিছুই করার থাকবে না।

তা শুনে সুলতান বললেন, এটা কেমন কথা! মহান আল্লাহর কসম! আমি গাছের ছায়ায় বসে থাকব না, কোনো দেয়ালের আড়ালেও লুকিয়ে থাকব না, যতক্ষণ না তারা আমাদের সাথে যা করেছে তার প্রতিশোধ নিই। আমাকে ১ হাজার বীরপুরুষ দাও, আমি আমার সামনে কাউকে দাঁড়াতে দেবো না!

বস্তুত '১ হাজার বীরপুরুষ দাও', এটি ছিল সুলতানের বিখ্যাত উক্তি। তিনি বলতেন, 'আমাকে ১ হাজার লোক দাও, আমার শুধু এটুকুই দরকার।' ক্রুসেডার, রোমানসহ ইসলামের সকল শত্রুকে ধ্বংস করতে যতবারই তিনি এগিয়েছেন, সবসময়ই বলেছেন, 'আমার কেবল ১ হাজার লোক দরকার।'

চিত্র : ত্রিপোলি, আরবি 'তারাবলুস'

মুসলিম উম্মাহর প্রতি প্রগাঢ় মমতা

তখনকার দিনে মুসলিম ভূখণ্ডে ক্রুসেডার ও শত্রুদের আস্ফালন বেড়েই চলেছিল। তারা মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এ প্রেক্ষিতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। সে সময় অনেকগুলো ছোট ছোট আমিরাত বা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রতিটি আমিরাতের আমিরদের কাছে চিঠি পাঠান। নাজমুদ্দিন, নয়িমুদ্দিনসহ অন্য অনেক আমির তাকেও চিঠি পাঠাত, যখন তারা শত্রুবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হতো। সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ.-ও তাদের কাছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠালেন।

প্রিয় পাঠক, উম্মাহর প্রতি সুলতানের দরদ দেখুন। তিনি আমিরদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, জুমার প্রতিটি খুতবায় ঐক্যের বার্তা দেওয়ার জন্য খতিবদের কাছে চিঠি দিয়েছেন। এখান থেকে আমাদের অনেককিছু শেখার আছে। আমাদেরকেও এ কাজ করতে হবে। এভাবেই মুসলিম উম্মাহকে একত্র করার কাজ করে যেতে হবে। তিনি যাদেরকে চিঠি পাঠাতেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করত। কিন্তু তিনি বলতেন, আমি তার সাথে যোগ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় পেলাম না।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলত, এই লোক একটা পাগল। তার নামাজ আর ইবাদত তাকে পাগল করে দিয়েছে! সে এসব কী করছে? সে কি সারা পৃথিবী চায়? সে কী করার চেষ্টা করছে? আবার কেউ কেউ বলত, আমাদের কোনো উপায় নেই, কারণ আমরা যদি তাদের একজনকে মেনে না নিই, তাহলে পরিণতি খারাপ হবে।

এমনই একজন ছিলেন আমির ফখরুদ্দিন। তিনি তার উপদেষ্টাদের নিয়ে দরবারে উপবিষ্ট অবস্থায় সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির চিঠি পান। চিঠি পড়ে তিনি তার উপদেষ্টাদের বললেন, এই চিঠি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? তারা বলল, আপনি তার সাথে যোগ দিন। তিনি বললেন, না, আমি যোগ দেবো না। সভাসদরাও বলল, আপনার সিদ্ধান্তই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত, আমরাও বসে থাকব। তার সাথে যোগ দিয়ে লড়াই করার কোনো কারণ নেই। তার নামাজ-রোজা তাকে পাগল করে তুলেছে। সে এখন একজন পাগল!

সুলতান অত্যধিক নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন এবং প্রচুর দোয়া করতেন। তাই সুলতানকে তারা পাগল মনে করত।

কিন্তু পরদিন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। যে ফখরুদ্দিন গতকাল সুলতানের সাথে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পরদিন সকালে সেই ফখরুদ্দিন রাস্তায় নেমে ডাকছিল, হাইয়া আলাল জিহাদ (জিহাদের জন্য বেরিয়ে এসো)।

তা দেখে সভাসদরা বলল, গতকাল আপনি আমাদের বলেছিলেন আপনি সুলতানের সাথে যোগ দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন না, কিন্তু এখন আপনি আবার মত পরিবর্তন করছেন?

ফখরুদ্দিন বললেন, আমি যদি তার সাথে যোগ না দিই, তাহলে ইতিহাস আমার সম্পর্কে কী লিখবে? আমার লোকেরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, কারণ এই উম্মাহর নুরুদ্দিনের মতো নেতা প্রয়োজন।

প্রিয় পাঠক, বর্তমানে এটিই আমাদের অভাব। আমাদের সত্যিকারের নেতা দরকার, কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলা নেতা প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের মধ্যেও নেতা হতে হবে।

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ.-এর সাথে সকলে যোগ দিয়েছিল। তিনি বেশিরভাগ আমিরকে একত্র করেছিলেন। হালাবের মতো ছোট শহর থেকে শুরু করে আরববিশ্বের প্রায় অর্ধেক, বা আরববিশ্বের চেয়েও বেশি অঞ্চল শেষপর্যন্ত তার অধীনে কাজ করেছিল। তিনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর তিনি শত্রুদের মোকাবিলায় এগিয়ে যান।

সে সময়কার কিছু ঘটনা শুনুন। কোনো এক লড়াইয়ে সুলতান সম্মুখসারিতে লড়াই করেছিলেন এবং তার সাথে অন্য একজন মুজাহিদ ছিল। হঠাৎ একটি তির উক্ত মুজাহিদের চোখে এসে লাগে। তা দেখে সুলতান তাকে বললেন,

: আল্লাহর শপথ! যদি তুমি জানতে যে, আল্লাহ তোমার জন্য এর বিনিময়ে কী পুরস্কার লিখে রেখেছেন!

এ কথা শুনে উক্ত মুজাহিদ তার চোখ থেকে তিরটি বের করে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

আরেক লড়াইয়ে তার পেছনে ছিল আমির নয়িমুদ্দিনের এক পুত্র। নয়িমুদ্দিন ছিলেন সুলতানের বিরোধী। তিনি মুনাফিক ছিলেন। তিনি নিজের ভূখণ্ড

ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করেছিলেন। আজ যেমন সৌদি আরব ও কুয়েত খ্রিষ্টানদেরকে নিজেদের দেশ ব্যবহার করার সুযোগ দেয়, ঠিক তেমনইভাবে নয়িমুদ্দিনও তা-ই করত। তাদের মতো মুনাফিকদের সহায়তায় ক্রুসেডাররা মুসলিম ভূখণ্ডকে নিজেদের ঘাঁটি বানিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করত। যখনই ক্রুসেডাররা আসত, এরা তাদেরকে সমাদর করত। কিন্তু সেও একবার বিপদে পড়ে সুলতানের কাছে সাহায্য চাইতে এলো, তিনি যেন ক্রুসেডারদের হাত থেকে তার ভূখণ্ড উদ্ধার করে দেন। নয়িমুদ্দিনের পুত্র এসেছিল সুলতানের কাছে। অবশেষে শহর দখলের পর সুলতান তাকে বললেন,

: আল্লাহর শুকরিয়া। আমরা সকলেই একটি সৌভাগ্যের অধিকারী আর আপনি দুটি সৌভাগ্যের অধিকারী। প্রথম সৌভাগ্য হলো, আমরা সকলেই বিজয়ী। দ্বিতীয় সৌভাগ্য হলো, আমাদের সাথে যোগ দিয়ে নিজের পিতাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন।

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. ৫০টিরও বেশি বড় বড় দুর্গের পতন ঘটিয়েছিলেন। আরববিশ্বে সেগুলো এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। দুর্গগুলো এত বিশাল, এত উঁচু এবং এত সুরক্ষিত ছিল যে, তা সহজে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সুলতান একের পর এক ৫০টি দুর্গ নিয়ন্ত্রণে নেন। এরপর তিনি শামের কিছু এলাকায় পৌঁছে তা অবরোধ করলেন। এই এলাকা তিনি তিনবার অবরোধ করেছিলেন। প্রথমবার দুর্গের অধিপতি হাল ছাড়েনি। দ্বিতীয়বারেও দখল করা সম্ভব হলো না। অবশেষে তৃতীয়বার এসে দুর্গ রক্ষক বলল, ঠিক আছে। আমি দখল ছেড়ে দিচ্ছি এবং আপনার আনুগত্য করব।

এরপর তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়লেন। তুরস্ক থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত সুলতানের দখলে ছিল। তিনি হালাবের শাসন দিয়ে শুরু করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে তুরস্ক থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অপরদিকে মিশর থেকে ইরাকও তার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

সুলতানের মহানুভবতা ও বিনয়

প্রিয় পাঠক, যে মহানায়কের কথা আমরা আজ বলছি, সাম্রাজ্য বিস্তারই তার জীবনের একমাত্র দিক নয়। যুগপৎ তিনি একজন সাহসী বীর সুলতান ও আলেম হওয়ার পাশাপাশি ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীও ছিলেন। তিনি সারা দেশে

ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আলেমদের বেতন-ভাতা চালু করেন, যেন তারা নির্বিঘ্নে ইলম শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি এতিমদের দেখাশোনা করতেন, বিধবাদের খবরাখবর রাখতেন। যখন যার যেটা প্রয়োজন হতো তিনি তার ব্যবস্থা করে দিতেন। একবার তার সভাসদরা তাকে বলেছিল, সুলতান, আপনার বাহিনী দিন দিন বড় হচ্ছে। সুতরাং তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে না।

তিনি বললেন, আমি কোথা থেকে এত অর্থ পাব? আমার তো কোনো সম্পত্তি নেই। কোনো সঞ্চয় নেই। তারা বলল, আপনি যাদের ভাতা দিয়ে থাকেন অর্থাৎ এতিম, বিধবা, গরিব মানুষ, তাদের ভাতার সামান্য অংশ কেটে নিয়ে আপনার সৈন্যদের দিয়ে দিন।

সুলতান সাথে সাথে বলে উঠলেন, না, না! আল্লাহর শপথ, এটা কখনোই হবে না! তারা জানতে চাইল, কেন? সুলতান তখন বললেন, তাদের তির কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তারা আমার সাথে লড়াই করে, যখন আমি তাদের পাশে থাকি না। আর তোমাদের তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, অথচ তোমরা তখনই লড়াই করো, যখন আমি তোমাদের পাশে থাকি।

এখানে 'তির' দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন দোয়া। যখন সুলতান লড়াইয়ের ময়দানে লড়াই করেন, তখন এই আলেম, এতিম, বিধবা ও দরিদ্র ব্যক্তিরা ঘরে বসে সুলতানের জন্য দোয়া করে, যা আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেন। কেবল শক্তিমত্তার বলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়, বরং দোয়ার মাধ্যমেই বিজয়ী হওয়া সম্ভব। এ কথাই সুলতান তার সভাসদদেরকে বুঝিয়েছেন।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি এমনই ছিলেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার বিনয়ের একটি উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল। অন্য যে-সকল সুলতান ছিলেন, যেমন সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ, সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সসহ আরও অনেকে, তাদের মূল নাম উচ্চারণের আগে সাত-আটটি উপাধি বা বিশেষণ বলতে হতো। কিন্তু সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. সবকিছু বদলে দেন। তিনি জনতাকে স্রেফ একটি বাক্যই দোয়ায় বলার আদেশ দেন। তা ছিল, 'হে আল্লাহ, আপনি আপনার অসহায় বান্দা নুরুদ্দিনকে সাহায্য করুন।' হ্যাঁ, তিনি নিজেকে একজন অসহায় এবং জনতার সেবক হিসেবে ভাবতেন।

তিল্ল হারেমের যুদ্ধ

প্রিয় পাঠক, মুসলমানরা শুধু ক্ষমতা ও শক্তির ওপর নির্ভর করে না, দোয়ার ওপরেই নির্ভর করে। যেমন দোয়ার ফলাফল দেখুন!

মিশরে একটি 'তিল্ল হারেম' নামক জায়গা আছে। এখানে ক্রুসেডারদের সাথে সুলতান নুরুদ্দিনের বাহিনীর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে তিনি শত্রুদের বাহিনী ঘিরে রেখেছিলেন, কিন্তু তাদের দুর্গের দখল নিতে পারছিলেন না। তখন সুলতান আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। তিনি সিজদায় পড়ে আল্লাহকে বলতে থাকেন,

يا رب، هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، فانصر أولياءك على أعدائك، - أي يا رب، إن نصرت المسلمين فدينك نصرت، فلا تمنعهم النصر بسبب محمود- اللَّهُمَّ انصر دينك ولا تنصر محموداً—من هو محمود الكلب.

হে রব, এরা আপনার বান্দা এবং এরাই আপনার বন্ধু। আর তারাও আপনার বান্দা, কিন্তু তারা আপনার শত্রু। সুতরাং আপনি আপনার বন্ধুদেরকে আপনার শত্রুদের ওপরে বিজয় দান করুন। হে রব, আপনি যদি মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন, তবে তো আপনার দ্বীনকেই সাহায্য করবেন। সুতরাং মাহমুদের (গুনাহের) কারণে আপনি মুসলমানদেরকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন না। হে আল্লাহ, আপনি আপনার দ্বীনকে সাহায্য করুন, মাহমুদকে নয়—মাহমুদ তো নিছক একটা কুকুর!

সুলতান এই দোয়া করতে থাকেন আর কাঁদতে থাকেন। সুলতানের এই রোনাজারির সময় আশেপাশে কেউই ছিল না, অর্থাৎ কেউই শুনতে পায়নি তিনি কী দোয়া করছেন। পরের দিন তার একজন উপদেষ্টা একটি স্বপ্ন দেখেন। উক্ত উপদেষ্টা আলেম ছিলেন। স্বপ্নে তিনি দেখলেন, একদল লোক তার কাছে এসেছে, যাদের সবার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। তাদের সর্বাগ্রে যিনি আছেন, তিনি সবচেয়ে বেশি সুন্দর মুখশ্রীর অধিকারী। দলনেতা উক্ত আলেম উপদেষ্টাকে বললেন, তোমাদের সুলতানকে গিয়ে বলো, আগামীকাল তিল্ল হারেম বিজয়

হবে।

এই বলে তিনি চলে যেতে লাগলেন। তখন উপদেষ্টা তাকে ডেকে বললেন, আপনি কে? আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আগামীকাল আমরা বিজয় লাভ করব, তার প্রমাণ কী? তখন তিনি বললেন, তোমাদের সুলতান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ, তোমার সেই বান্দাদের সাহায্য করো, যারা তোমার আনুগত্যশীল। এবং তাদেরকে তোমার এমন বান্দাদের ওপর বিজয় দান করো, যারা তোমার শত্রু। তোমার কুকুর নুরুদ্দিনের গুনাহের কারণে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করো না।' তাকে সেই দোয়ার কথা হুবহু মনে করিয়ে দেবে। সেটাই হলো প্রমাণ।

প্রিয় পাঠক, এটি কোনো বানোয়াট ঘটনা নয়। আল্লাহর কসম! এগুলো সবই গ্রহণযোগ্য ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে নেওয়া। ইবনুল আসির সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি সম্পর্কে অনেককিছু লিখেছেন। কারণ এই মহান ব্যক্তি খুবই অনন্য। অতএব, এই ব্যক্তির ইতিহাস আমাদের মন থেকে বিস্মৃত হয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই তার নাম পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

যাই হোক, উক্ত উপদেষ্টা আলেম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যে উজ্জ্বল মুখশ্রীর ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেছেন তিনি আর কেউ নন, সাইয়িদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেউ আল্লাহর রাসুলকে মিথ্যা স্বপ্ন দেখে না। আপনি যদি আপনার স্বপ্নে নবীকে দেখেন এবং তিনি নবীর সাথে সাদৃশ্য রাখেন, তিনি অবশ্যই নবী। কিন্তু তাকে নবীর সদৃশ হতে হবে। শয়তান নবীর রূপ ধারণ করতে পারে না। কোনো দাড়িবিহীন ব্যক্তি এসে নবী দাবি করবে এমন কখনো হয় না। যাই হোক, যদি দেখা ব্যক্তিটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত নবীর সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তবে আমরা বলতে পারি, আপনি যাকে দেখেছেন তিনি শতভাগ নবী, শতভাগ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ কথার ভিত্তিতে বলা যায়, উক্ত আলেম নবীকে দেখেছিলেন এবং তিনি তা জানতেন। তিনি এই স্বপ্ন দেখে বেশ বিস্মিত হন।

পরদিন সকালে উঠে তিনি সুলতানকে খুঁজতে লাগলেন। সুলতানকে খুঁজে পেয়ে দেখলেন, তিনি ইবাদতে মগ্ন। সুলতান অনেক বেশি ইবাদত করতেন এবং তা দীর্ঘ সময় ধরে করতেন। উক্ত আলেম সুলতানের তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন সুলতানের ইবাদত শেষ হলো, তিনি তার কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা বললেন। সুলতান স্বপ্নের কথা জেনে এই স্বপ্নের প্রমাণ

জানতে চাইলেন। যেহেতু সুলতানের কৃত দোয়া কেউ শুনতে পায়নি, কেবল আলেমকে স্বপ্নে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে সুলতানের দোয়ার কথা বলেছিলেন, তাই উক্ত আলেম সুলতানের কাছে প্রমাণস্বরূপ এই দোয়ার কথা বললেন। কিন্তু তিনি সুলতানের দোয়ার শেষ অংশ অর্থাৎ 'নুরুদ্দিন তো নিছক একটা কুকুর', এ কথাটি এড়িয়ে গেলেন। তা মূলত তিনি শ্রদ্ধাজনিত কারণে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান পুরোপুরি জানতে চাইলেন। তাই আলেম তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পুরোপুরি বললেন। তখন সুলতান বললেন, হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আমরা বিজয়ী হতে যাচ্ছি। এরপর মাগরিবের সময় সুলতানের বাহিনী বিজয় লাভ করে।

সুলতানের জুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা

আল্লাহর কসম! তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি বিশ্বের বহু অংশ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, এতৎসত্ত্বেও কখনো কখনো তার কাছে খাওয়ার মতোও একটু কিছু থাকত না! যেমন তার স্ত্রীর একটি ঘটনা আমাদের নারীদের জন্য শিক্ষা হতে পারে। একবার তার স্ত্রী তাকে বললেন, আমাদের কিছু জিনিসপত্র প্রয়োজন। আমাদের ভালো খাবার দরকার। আমাদের বিলাসবহুল দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে হবে। স্ত্রী এ কথা বললে সুলতানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তিনি স্ত্রীকে বললেন, আমি তোমার জন্য এসব বিলাসী ভালো খাবার কোথা থেকে আনব?

লক্ষ করুন, এ কথা বলছেন এমন একজন ব্যক্তি, যার শাসন ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তখন বহু দেশ! অথচ তার বাড়িতে কিছুই নেই!

তারপর তিনি স্ত্রীকে বললেন, হালাবে আমার তিনটি দোকান আছে। এবং এ কথা বলে তিনি তার স্ত্রীকে দোকানে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই দোকানের বিক্রিলব্ধ অর্থ তোমার জন্য। আমাকে আর কিছু বলবে না। আমি একটা অভিযানে যাচ্ছি।

বস্তুত এটাই আমাদের নারীদের জন্য শিক্ষা, স্বামীকে সম্পদের জন্য ব্যস্ত না করা। সুলতানের নিজস্ব সম্পদ তিনটি দোকান থেকে মাসপ্রতি ২০টি দিনার আসত, যা তখনকার দিনে তেমন অঢেল কিছুই নয়, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক পয়সার মতো। অথচ এটাই ছিল সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির সমুদয়

সম্পদ, তার ব্যক্তিগত সম্পদ। মূলত তিনি অন্য আমিরদের মতো সম্পৎশালী হতেই চাননি, যারা স্রেফ নিজেদের ভূখণ্ড নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। তারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো ভূখণ্ডকে ব্যবহার করত। কিন্তু সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, মুসলিম উম্মাহকে বিজয়ী করতে চেয়েছিলেন।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা সুরক্ষা

হিজরি ৫৫৭ সালের একরাতের ঘটনা।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. তাহাজ্জুদ ও আল্লাহর কাছে রোনাজারির পর ঘুমিয়ে পড়েছেন। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। এ সময় সুলতান আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে তিনি ঘরে এসে দুজন নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,

— মাহমুদ, এরা আমাকে জ্বালাতন করছে। এই দুজন লোক থেকে আমাকে মুক্ত করো।

এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে নুরুদ্দিন জিনকি রহ. ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে গেলেন। তিনি কী করবেন বুঝতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার কামরায় পায়চারি করতে লাগলেন। সাথে সাথে তার মাথায় বিভিন্নপ্রকার চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আমাকে দুজন লোকের চেহারা দেখানো হলো কেন? আল্লাহর রাসুল তো এখন রওজায়। আর শয়তান তো আল্লাহর নবীর রূপ ধারণ করেও আসতে পারে না। তাহলে কি আমি সত্য স্বপ্ন দেখেছি? এসব ভাবতে ভাবতে সুলতান অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি অজু-গোসল সেরে দুরাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর আল্লাহর কাছে দীর্ঘ সময় কান্নাকাটি করে মোনাজাত করতে থাকলেন। তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কারণ এটি এমন এক স্বপ্ন, যা কাউকে বলা যায় না। তাই তিনি আবারও আল্লাহর নাম নিয়ে শুয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর যখনই আবার ঘুম এলো সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবারও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাকে প্রথমবারের মতোই বলছেন,

— মাহমুদ, এ দুজন লোকের হাত থেকে আমাকে মুক্ত করো।

এবার সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. আল্লাহর নাম নিতে নিতে বিছানা থেকে উঠে বসলেন। আবারও তিনি অজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর আল্লাহর কাছে পুনরায় কান্নাকাটি করে দোয়া করলেন। কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না ঠিক কী করা উচিত। পুরো পৃথিবী নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু কোথাও না কোথাও দুজন লোক যেন আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তিনি নিরুপায় হয়ে আকাশের পানে তাকালেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন। রাত এখনো অনেক বাকি। তিনি আবারও শুয়ে পড়লেন। শোয়ার পর তৃতীয়বারও তিনি একই ধরনের স্বপ্ন দেখলেন। এরপর সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. কাঁদতে কাঁদতে বিছানা থেকে উঠে বসলেন। এবার তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা কোনো না কোনো ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি অজু-গোসল করে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে প্রধানমন্ত্রী জালালুদ্দিন মসুলির কাছে গিয়ে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে স্বপ্নের বিবরণ শোনালেন। এ ব্যাপারে সুচিন্তিত পরামর্শ চাইলেন। জালালুদ্দিন মসুলি স্বপ্নের কথা শুনে বললেন,

: সুলতান, আপনি এখনো বসে আছেন? নিশ্চয়ই রাসুলের রওজা মোবারক কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তাই এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য বারবার তিনি আপনাকে স্মরণ করছেন। সময় নষ্ট না করে অতিসত্বর মদিনার পথে রওনা দিন!

নুরুদ্দিন জিনকি রহ. আর কালবিলম্ব করলেন না। তিনি ১৬ হাজার দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য এবং বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে বাগদাদ থেকে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। রাতদিন সফর করে ১৭ তম দিনে মদিনা শরিফ পৌঁছলেন এবং সৈন্যবাহিনীসহ অজু সেরে দুরাকাত নফল আদায় করলেন। দীর্ঘ সময় ধরে মুনাজাত করলেন। তারপর মদিনা ঘেরাও করে ফরমান জারি করলেন যে, বাইরের লোক মদিনায় আসতে পারবে, কিন্তু মদিনা থেকে কোনো লোক বাইরে যেতে পারবে না। সুলতান এরপর জুমার খুতবা দিয়ে মদিনাবাসীকে দাওয়াত করলেন,

: আমি মদিনাবাসীকে দাওয়াত দিয়ে একবেলা খাওয়াতে চাই, সকলেই যেন এই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে।
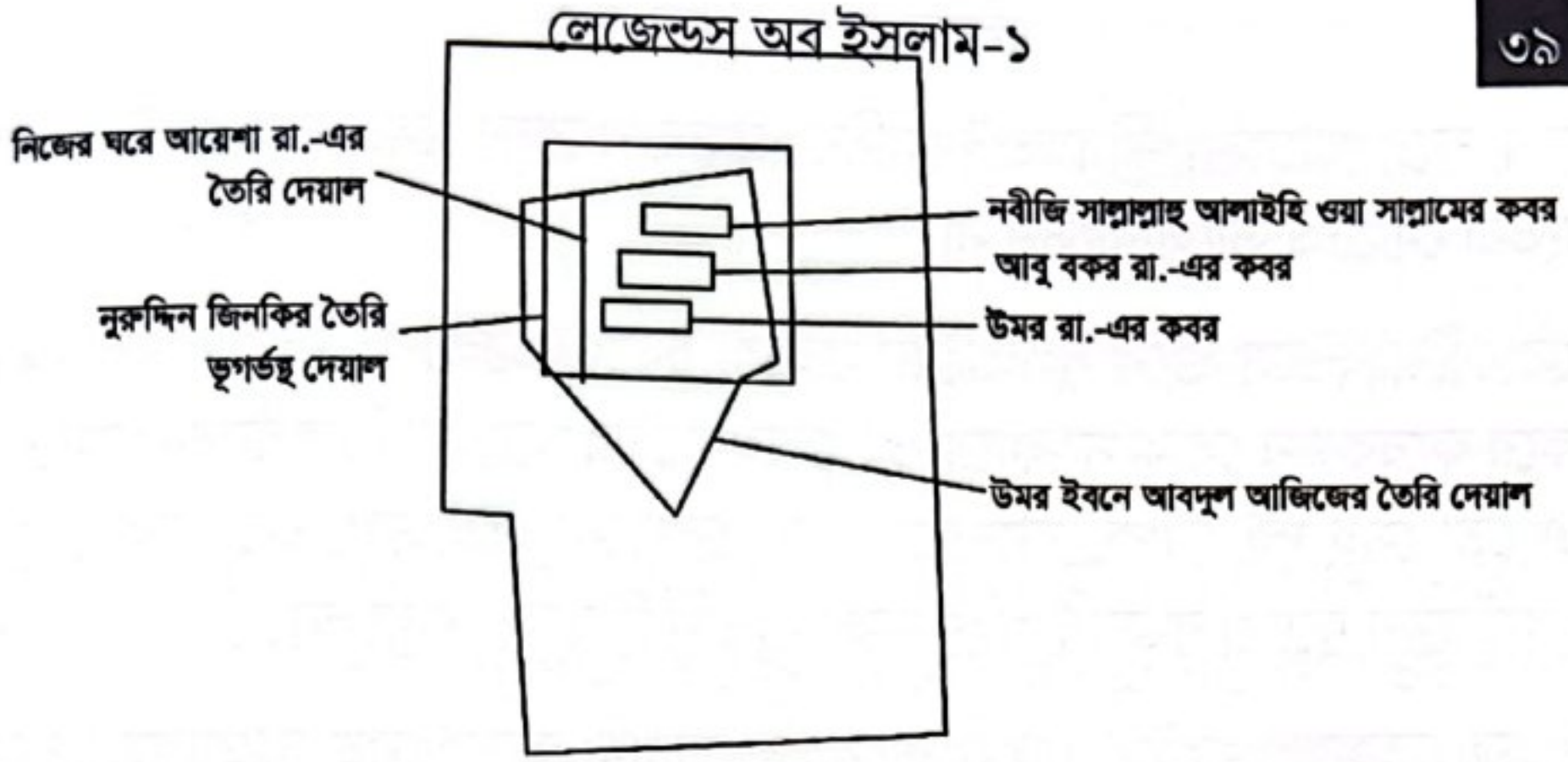
চিত্র : নিরাপদ রওজা

সুলতান মদিনাবাসীকে খাওয়ানোর জন্য বিশাল আয়োজন করলেন এবং প্রত্যেককে অনুরোধ করলেন, মদিনার কোনো লোক যেন এই দাওয়াতে অনুপস্থিত না থাকে। নির্ধারিত সময়ে খাওয়াদাওয়া শুরু হলো। প্রত্যেকেই তৃপ্তিসহকারে খাবার খেল। যারা দূরের লোক হওয়ার কারণে আসতে পারেনি, তাদেরকেও শেষ পর্যন্ত ঘোড়া ও গাধার পিঠে চড়িয়ে আনা হলো। এভাবে প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত অগণিত লোক শাহি দাওয়াতে শরিক হওয়ার পর সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, আর কেউ কি বাকি আছে? জানা গেল কেউ বাকি নেই।

এ কথা শুনে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। যদি আর কোনো লোক বাকি না থাকে তবে সেই দুজন গেল কোথায়? এসব চিন্তায় বেশ কিছুক্ষণ তিনি ডুবে রইলেন। তারপর আবারও তিনি নতুন করে ঘোষণা দিলেন,

: আমার বিশ্বাস, মদিনার সকল লোক এখনো আসেনি। অতএব সবাইকে আবারও অনুরোধ করা যাচ্ছে, যারা এখনো আসেনি তাদেরকে যেন নিয়ে আসা হয়। এ কথা শুনে মদিনাবাসী সকলেই একবাক্যে বলে উঠল,

: সুলতান, মদিনার আশেপাশে এমন কোনো লোক বাকি নেই, যে আপনার দাওয়াতে আসেনি। তখন সুলতান বললেন,

: আমি ঠিকই বলেছি। আপনারা ভালো করে দেখুন। সুলতানের এই দৃঢ়তা দেখে এক ব্যক্তি হঠাৎ করে বলে উঠল,

: সুলতান, আমরা দুজন লোককে চিনি, যারা সম্ভবত এখনো আসেনি। তারা পরহেজগার দরবেশ মানুষ। কখনো কারও কাছ থেকে হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করেন না, এমনকি কারও দাওয়াতেও উপস্থিত হন না। তারা নিজেরাই অনেক

দান করে থাকেন। নীরবতাই অধিক পছন্দ করেন। লোকসমাজে উপস্থিত হওয়া মোটেও ভালোবাসেন না।

লোকটির বক্তব্য শুনে সুলতানের চেহারা চমকে উঠল। তিনি কালবিলম্ব না করে কয়েকজন লোক সহকারে ওই লোক দুটোর ঘরে উপস্থিত হলেন। আরে, এ তো সেই দুই লোক, যাদেরকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল! তাদেরকে দেখে সুলতানের দুচোখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

: কে তোমরা? কোথা থেকে এসেছ? তোমরা সুলতানের দাওয়াতে কেন উপস্থিত হলে না? লোক দুটো বলল,

: আমরা মুসাফির। হজের উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। হজ করে জিয়ারতের নিয়তে রওজা শরিফে এসেছি। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় ফিরে যেতে মনে চাইল না। তাই বাকি জীবন নবীর রওজার পাশে কাটিয়ে দেওয়ার নিয়তেই এখানে রয়ে গেছি। আমরা কারও দাওয়াত গ্রহণ করি না। এক আল্লাহর ওপরই আমাদের পূর্ণ আস্থা। আমরা তারই ওপর নির্ভরশীল।

উপস্থিত জনগণও বলল যে,

: সুলতান, এরা দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে অবস্থান করছে। সবসময় দরিদ্র, এতিম ও অসহায় লোকদের প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে। তাদের দানের ওপর এ এলাকার অনেক পরিমাণ লোকের জীবিকা নির্ভর করে।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. তাদের কথা শুনে লোক দুটোর প্রতি পুনরায় গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন। কিন্তু আবারও তিনি নিশ্চিত হলেন, এরাই তারা, যাদেরকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। এবার সুলতার গম্ভীর স্বরে তাদেরকে বললেন,

: সত্য কথা বলো। তোমরা কে? কী উদ্দেশ্যে এখানে অবস্থান করছ?

কিন্তু এবারও তারা একই কথা বলল। সুলতান এবার কারও কথায় কান না দিয়ে তাদেরকে সেখানে নজরবন্দি রাখার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাদের থাকার জায়গায় গিয়ে খুব ভালো করে অনুসন্ধান চালালেন। বহু ধনসম্পদ পাওয়া গেল। কিন্তু এমন কোনোকিছুই পাওয়া গেল না, যা দিয়ে স্বপ্নের কোনো

সুরাহা হয়। এদিকে মদিনায় বহু লোক তাদের জন্য সুপারিশ করছে। তারা আবারও বলছে,

: সুলতান, এরা নেককার লোক। দিনভর রোজা রাখে। রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগিতে কাটায়।

সুলতান তাদের কথা শুনে আশ্চর্য হলেন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়ছেন না। কক্ষের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন। ঘরের প্রতিটি বস্তুকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। কিন্তু সন্দেহ করার মতো কিছুই তিনি পাচ্ছেন না। এক পর্যায়ে সঙ্গীদের বললেন,

: আচ্ছা, তাদের জায়নামাজটা একটু ওঠাও দেখি।

নির্দেশ পালন করা হলো। জায়নামাজটি বিছানো ছিল একটি চাটাইয়ের ওপর। সুলতান সেটাও সরানোর নির্দেশ দিলেন। চাটাই সরানোর পর দেখা গেল একটা বিশাল পাথর সেখানে রাখা। সুলতানের নির্দেশে তাও সরানো হলো। এবার দেখা মিলল এমন একটি সুড়ঙের, যা বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। এমনকি তা রওজা শরিফের খুব কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। তা দেখা মাত্র ক্রোধে লাল হয়ে যায় সুলতানের মুখমণ্ডল। লোক দুটোকে লক্ষ করে আহত সিংহের মতো গর্জন করে বললেন,

: তোমরা পরিষ্কার ভাষায় সত্য কথা খুলে বলো, নইলে এক্ষুনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে। বলো তোমরা কে? তোমাদের আসল পরিচয় কী? কারা, কী উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে? সুলতানের কথায় তারা ঘাবড়ে গেল। কঠিন বিপদ দেখে আসল পরিচয় প্রকাশ করে বলল,

: আমরা ইহুদি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদেরকে মসুল শহরের ইহুদিরা সুদক্ষ প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচুর অর্থ সহকারে এখানে পাঠিয়েছে। আমাদেরকে এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, আমরা যেন যেকোনো উপায়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ বের করে ইউরোপীয় ইহুদিদের হাতে হস্তান্তর করি। এই দুরূহ কাজে সফল হলে তারা আমাদেরকে আরও ধনসম্পদ দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুনে সুলতান বললেন,

: তোমরা তোমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলে? কীভাবে তোমরা কাজ করতে? তারা বলল,

: আমাদের নিয়মিত কাজ ছিল, রাত গভীর হলে অল্প পরিমাণ সুড়ঙ্গ খনন করা এবং সাথে ওই মাটিগুলো চামড়ার থলেতে ভর্তি করে অতি সন্তর্পণে মদিনার বাইরে নিয়ে ফেলে আসা। আজ দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। ঠিক যে সময় আমরা রওজা মোবারকের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বনবীর লাশ বের করে নিয়ে যাব, ঠিক সে সময় আমাদের মনে হলো, আকাশ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। মাটি যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে থরথর করে কাঁপছে। যেন সমগ্র পৃথিবীজুড়ে মহাপ্রলয় সংঘটিত হচ্ছে। অবস্থা এতটাই শোচনীয় রূপ ধারণ করল, মনে হলো সুড়ঙ্গের ভেতরেই যেন আমরা বিলীন হয়ে পড়ব। এ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে আমরা কাজ বন্ধ করে রেখেছি।

তাদের বক্তব্য শুনে সুলতান সব বুঝে ফেললেন। তাই তিনি লোক দুটোকে নজিরবিহীন শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এমন দুঃসাহস দেখাতে না পারে। তিনি মসজিদে নববি থেকে অর্ধ মাইল দূরে একটি বিশাল ময়দানে ২০ হাত উঁচু একটি কাঠের মঞ্চ তৈরি করলেন। সাথে সাথে সংবাদ পাঠিয়ে মদিনা ও মদিনার আশেপাশের লোকদেরকে উক্ত ময়দানে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্ধারিত সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত মাঠে সমবেত হলো। সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. অপরাধী লোক দুটোকে লোহার শিকলে বেঁধে মঞ্চের ওপর বসালেন। তারপর বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে তাদের হীন চক্রান্ত ও ঘৃণ্য তৎপরতার কথা উল্লেখ করলেন। লোকজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করল। সুলতান লোকদেরকে বিপুল পরিমাণ লাকড়ি সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন। তারপর লক্ষ জনতার সামনে সেই ইহুদি দুটোকে মঞ্চের নিচে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলেন। এরপর তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সিসা দিয়ে রওজা শরিফের চারপাশে শক্ত প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। যেন ভবিষ্যতে আর কেউ প্রিয় নবীজির কবর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম না হয়।[৬]

বস্তুত তিনি আল্লাহর কাছে এতটাই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যে, তিনি তার কাছ থেকে এই মহান খেদমত গ্রহণ করেছেন।

আমার পিতা (অর্থাৎ, শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের পিতা) যখন মদিনায় পড়াশোনা করতেন, তখন এক মদিনাবাসীরও একইরকম স্বপ্ন ছিল। প্রায় ২৫

---

৬. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া।*

বছর আগের ঘটনা। অনুরূপ একটি স্বপ্ন এক মদিনাবাসী দেখে, যেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন,

: আমাকে উদ্ধার করো বা আমার ওপর যা আসছে তা থেকে রক্ষা করো।

মূলত মদিনায় বন্যা হয়েছিল। সেই বন্যার বর্জ্য রওজার কাছে এসে গিয়েছিল। পরে তারা সেটা খুঁজে বের করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রা.-এর চারপাশে খনন করে। এই ঘটনা মদিনাবাসী জানে। তারা নবীর কবর খনন করেনি, কিন্তু তারা কবরের চারপাশে এবং আবু বকর ও উমর রা.-এর চারপাশে খনন করে সিমেন্টের আস্তর দিয়ে সিল করে দেয়।

এ ধরনের স্বপ্ন শুধু সম্মানিত ব্যক্তিরাই দেখেন। আমরা কতজন স্বপ্নে নবীকে দেখেছি? আমরা যদি নবী আ.-কে নিয়েই ব্যস্ত থাকি, তার গল্প পড়ি, তবে হয়তো আমরা সবাইও আজ রাতেই সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর মতো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখব ইনশাআল্লাহ। পক্ষান্তরে যদি আমরা আল্লাহর রাসুলের পথে না থাকি, যদি তাকে ভালো না বাসি, যদি তাকে অনুকরণ না করি, তবে দেখতে পাব না। সুন্নতকে ভালোবাসলে তাকে স্বপ্নে দেখা যাবে। আর যখন কেউ আল্লাহর রাসুলকে তার স্বপ্নে দেখেন তখন এটিই তার জীবনের অন্যতম সেরা অর্জন। এটিই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সুলতানের ইবাদতে নিমগ্নতা

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. যেমনইভাবে প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, ঠিক তেমনইভাবে মহান বীরও ছিলেন। তার সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম জাওজি রহ.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিখ্যাত উক্তি আছে। তার সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন। তা হলো, সুলতানের সাফল্যের রহস্য ছিল তার ইবাদত। এই ব্যক্তি সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। আমরা কয়জনই-বা এমন আছি, যারা সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর মতো সারারাত্রি নামাজে কাটাই? হ্যাঁ, আমরা হয়তো তার মতো তরবারি বহন করতে পারবে না, কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জনই-বা রাতে উঠে নামাজ পড়ি? কয়জনই-বা তার মতো সুন্নাহ অনুসরণ করি? আমরা কয়জনই-বা নবী ও সাহাবিদের অনুকরণ করি, তাদের ভালোবাসি এবং এই উম্মাহর নিপীড়িত

অবস্থা নিয়ে এত যন্ত্রণা বোধ করি? অথচ এসব কাজ আমার-আপনার সাধ্যে ও নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা চাইলেই করতে পারি। হয়তো সুলতান এমন অনেককিছু করেছেন, যা আমার-আপনার সাধ্যে নেই।

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. সুন্নাহর কঠোর অনুসরণ করতেন। তিনি ইশার নামাজের পর কারও সাথে কথা বলতেন না। কারণ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার পরপরই বিছানায় চলে যেতেন। সুলতানও তাই করতেন। আবার মাঝরাতে উঠে নামাজে দাঁড়াতেন। মসজিদে গিয়েও ফজরের আগ পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন। তার স্ত্রী বলছেন, তিনি ফজর পর্যন্ত নামাজ পড়তেন। তারপর ওয়াক্ত হলে ফজরের নামাজ পড়ে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকির, ইসতেগফার, তাহমিদ পড়তেন। এরপর দুই রাকাত ইশরাকের নামাজ পড়তেন। তারপর তিনি বাজারে গিয়ে লোকদের জাগিয়ে নিশ্চিত হতেন যে, তারা সবাই নামাজ পড়েছে।

তার আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। মূলত এই বৈশিষ্ট্যই তাকে মহান বানিয়েছে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য আমরা এটিই করতে পারি। আর সবসময় জিকির, তাহমিদ ও ইসতেগফার পড়তে পারি। মহান আল্লাহর কসম! তার সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো, তিনি কখনো তারাবির নামাজ ছাড়েননি। অথচ আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যারা রমজান মাসে তারাবির নামাজ পড়ে না। অথচ রমজান একটি পবিত্র মাস, এই মাস কিয়ামুল লাইলের মাস, কিন্তু এ মাসেও যদি আমরা ইবাদত করতে না পারি তবে তো আমরা ব্যর্থ উম্মাহ। আমরা তারাবি না পড়ার নানান রকম অজুহাত দিই। নানান মত উল্লেখ করি। এই ব্যর্থতা কোন ধরনের? বস্তুত রমজানে তারাবির নামাজ পড়তে না পারলে এই উম্মাহর মধ্যে কাপুরুষ তৈরি হবে। একদিন বাদ দেওয়া মানে ৭০ গুণ সওয়াব হারানো। মূলত এই সওয়াব অর্জনের মধ্য দিয়েই আমরা সুলতান নুরুদ্দিনের উত্তরসূরি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করব। এটাই তো আমাদের লক্ষ্য।

আমরা কাউকে ছোট করতে চাই না, আমরা কাউকে চাপ দিতে চাই না। আমরা নুরুদ্দিনের মতো বীরদের আবারও দেখতে চাই। এই কারণেই আমার (অর্থাৎ, শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের) পরিচিত কিছু লোক বিরক্ত হয়। আমি কেন তারাবির ওপর অটল থাকি। অথচ আমাদের এমন লোক দরকার, যারা শুধু

রমজানে নয়, রমজানের পরেও রাতে নামাজ পড়বে!

এই উম্মতে কি এমন কেউ নেই, যে দোয়া করতে পারে, 'হে আল্লাহ, ইহুদিদের ধ্বংস করুন'—আর আল্লাহ্ তার জবাব দেবেন!

কেউ কি বলবে না, ইয়া আল্লাহ্, শ্যারনকে ধ্বংস করুন এবং তাদের টুকরো টুকরো করে দিন!

এই কসাই সন্ত্রাসীর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য উম্মতের মধ্যে এমন কেউ কি নেই? দোয়া করা তো কোনো অবৈধ কাজ নয়! হয়তো আমি-আপনি উম্মাহর জন্য দান এবং অন্যান্য কাজ করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহর কাছে আপনার হাত বাড়ালে কেউ তো আমাকে-আপনাকে তা করা থেকে আটকাতে পারবে না! আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন! আল্লাহর কাছে তাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করুন! ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইয়েরা সে সময় যেভাবে কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন এখনো সেভাবেই যাচ্ছেন, কিন্তু এখন আর কোনো সুলতান নুরুদ্দিন নেই।

মহানায়কের প্রস্থান

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. ৫৮ বছর বয়সে ইনতেকাল করলেন। কীভাবে মারা গেলেন এই মহানায়ক? তিনি আসলে মারা যাননি। তিনি অমর হয়ে আছেন। আমরা কী করে ভাবতে পারি যে, এমন এক বীরেরও মৃত্যু হবে, যিনি এত ভূমি দখল করে, অপর প্রান্ত থেকে ক্রুসেডার ও রোমানদের বিস্তার বন্ধ করে, আর ক্রুসেডার অধ্যুষিত কুদসের হেড কোয়ার্টার ধ্বংস করে মুসলিমবিশ্বকে একত্র করেছিলেন!

এই মহানায়কের প্রস্থান স্বাভাবিকভাবে হয়নি। তিনি জিহাদের ময়দানে শহিদ হননি। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সেভাবেই, যেভাবে সবাই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। মৃত্যু সবসময় তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তিনি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে শহিদ হওয়ার ইচ্ছা করতেন। তিনি চাইতেন, তিনি এমনভাবে শহিদ হোন, যেন কেউ তাকে চিনতে না পারে। তার উপদেষ্টাবৃন্দ তাকে একবার আল্লাহর কাছে এরকম দোয়া করতে শুনেছিল। একজন উপদেষ্টা বলেন, আমি তাকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে দেখেছি যে, তিনি পশুর শিকার হতে চান। তিনি বলছিলেন,

: হে আল্লাহ, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমার মাংস টুকরো টুকরো করে দাও। পাখিরা আমার মাংস খেয়ে নিক, শিকারি পশুরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার মাংস খেয়ে পথে ফেলে রাখুক। আমি কবরস্থ হতে চাই না। আমাকে কবরস্থানে থাকতে হবে না। আমি আমার কবরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ চাই না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি ছিন্নভিন্ন হতে চাই।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর মতো তিনিও বিছানায় মারা যান। যে রোগে তিনি মারা যান তা বর্তমান সময়ে গলার ক্যান্সার বলা যায়। বস্তুত জ্ঞানী মানুষেরা মৃত্যুর পেছনে দৌড়ানোর কথা বলে থাকেন,

احرص على الموت توهب لك الحياة.

মৃত্যুর পেছনে ছোটো, তোমাকে জীবন দান করা হবে।[৭]

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. শত শত যুদ্ধ করেছেন। শতাধিক যুদ্ধে তার লক্ষ্য ছিল শহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করা। কিন্তু তিনি কীভাবে ইনতেকাল করলেন? মৃত্যুকালে তিনি বলেন, আমি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেড়ার মতো মরে যাচ্ছি, সাধারণ মানুষের মতো মরে যাচ্ছি তা কিন্তু নয়। আমার মৃত্যু হলেও যেন কাপুরুষের চোখে কখনোই ঘুম না আসতে পারে। (অর্থাৎ, এত যুদ্ধ করেও আমার মৃত্যু যেভাবে ও যেখানে হওয়ার কথা ছিল, সেভাবেই হচ্ছে, শত ময়দান থেকেও আমি বেঁচে ফিরেছি; তাই কাপুরুষরা যেন ভয়ে যুদ্ধজিহাদ ত্যাগ না করে।)

মূলত মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একজন মুসলমানের যখনই প্রয়োজন হয় তখনই সে তার প্রাণকে তার হাতে তুলে নেয়। এটাই তো মুসলমানের পরিচয়। মুসলমান বলতে কী বোঝায়? মুসলমানিত্ব হলো নিজের জান বাজি রাখা। যখন এমন সময় আসে, লোকেরা বিরোধিতা করে, আতঙ্কিত হয়, নিহত হয়, ধ্বংস হয় বা পরাজিত হয়, একজন মুসলমান তখন তার জানকে আল্লাহর জন্য হাতে তুলে নিতে চায়। একজন মুসলমান কী চিন্তা করে? সে কিছুই চিন্তা করে না। শত্রুরা তাকে জেলের ভয় দেখায়। তখন মুসলমান বলে, কারাগারের চাবি কোথায়? সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারাগারের চাবি খোঁজে। আমরা যদি আনুগত্য ও ত্যাগের কথা বলি, ওয়ালা-বারা আর আধুনিকতার বিপরীতে

৭. খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে নসিহত করতে গিয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দিক কথাটি বলেছিলেন।

দাঁড়িয়ে বিরোধিতা করি, তাহলে কারাগারের চাবি আমাদের খুঁজতে হবে। যদি আমরা শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণার কথা বলি তাহলে কারাগারের চাবি আমাদের খুঁজতে হবেই। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন।[৮]

প্রিয় পাঠক, জান্নাত ক্রয় এত সস্তা বিষয় নয়। আল্লাহ কিন্তু আমার-আপনার জীবন কিনে নিয়েছেন। দেখুন, আমরা যখন আমাদের গাড়ি বিক্রি করি তখন ক্রেতা আমার বিক্রিত গাড়ি দিয়ে কী করবে তার বিষয়। এতে আমি কী করব? ক্রেতা চাইলে এটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, চাইলে ফেলে দিতে পারে, চাইলে ব্যবহার করতে পারে, কিছু প্রতিস্থাপন করতে পারে। ঠিক তেমনইভাবে আমরাও নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করেছি। আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করেছি, যেন আমরা বেহেশতের জন্য কবুল হতে পারি। এখন শত জেলজীবন হোক, মেনে নিতে হবে। মৃত্যু হোক, মেনে নিতে হবে। এভাবেই আমরা সেসব পুরুষের উত্তরাধিকার বহন করতে পারব, যারা এই উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এই উম্মাহ আজ মৃত। আল্লাহর কসম! উম্মাহ আজ মৃত! এ কারণেই আমরা এই মহান ব্যক্তিকে আমাদের আলোচনায় নিয়ে এসেছি, যিনি ঐক্যবদ্ধ করেছেন এই মৃত উম্মাহকে।

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. ৫৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি মুসলিমবিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। তিনি ক্রুসেডারদের আগ্রাসন থামিয়েছেন। তিনি রোমানদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছেন। তিনি মুনাফিকদের মাথা কেটে ফেলেছেন। তিনি ইসলামি উম্মাহর সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। উম্মাহকে নিরাপদ বোধ করিয়েছেন। তিনি এই চিন্তায় ঘুমাতে পারতেন না যে, এই উম্মাহ কীভাবে নিরাপদ বোধ করতে পারবে। তিনি তার সীমান্তের উপকণ্ঠ রক্ষা করতে পায়রার ব্যবহার শুরু করেছিলেন। কারণ সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ

৮. সুরা তাওবা : ১১১।

জিনকি রহ. একজন মুসলমানকে মরতে দেখে অপেক্ষা করতে পারতেন না। এদিকে তৎকালে যেহেতু প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল না, তাই সীমান্তে কারও ওপর শক্ররা আক্রমণ করলে সুলতানের দূত খবর নিয়ে পৌঁছতে বেশ কিছুদিন লেগে যেত। ততক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তি পৃথিবী ছেড়ে চলে যেত। তাই সুলতান দ্রুত সংবাদ পাওয়ার জন্য পায়রার ব্যবহার শুরু করেন।

কোনো মুসলমান মরবে আর সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি প্রতিরোধ করবেন না, তা হতে পারে না। তাই তার সাম্রাজ্যের পুরো সীমান্তে পায়রার ব্যবহার ছিল। যখনই সীমান্তরক্ষীরা ক্রুসেডারদের পেত বা কোনো রোমান সৈন্য কিংবা যে-কেউই সীমান্তে আক্রমণ করতে আসত তখনই কেবল একটি কবুতর পাঠানো হতো। কবুতরটি আসার সাথে সাথে কয়েক দিনের মধ্যেই সুলতান সেখানে পৌঁছে মুসলমানদের ধ্বংস ও হত্যা করা থেকে শক্রদের বাধা দিতেন। সুলতান এভাবেই সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সুলতানের অভূতপূর্ব ন্যায়বিচার

একবার কোনো এক আর্থিক বিষয়ে সুলতান নুরুদ্দিন কোনো এক সাধারণ ব্যক্তির সাথে মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়েন। তিনি লোকটিকে নিয়ে আদালতে হাজির হন। তিনি মূলত চাচ্ছিলেন লোকটি যে অর্থ নিজের বলে দাবি করছে তা তাকে দিয়ে বিদায় করতে। কিন্তু তবুও তিনি বিচারকের কাছে যান এবং বিচারককে বলেন, আমি আমির। কিন্তু আপনি আমাকে এমনভাবে দেখবেন, যেন আমি একজন সাধারণ মানুষ, ঠিক এই লোকটির মতো।

এই বলে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক সিদ্ধান্ত দেবেন যে, অর্থ সুলতানের, কিন্তু সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ওই লোকটিকে বললেন, যে অর্থ তুমি তোমার বলে দাবি করছ তা মূলত আমার। কিন্তু আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম, তুমি তা নিয়ে নাও।

তার কথা শুনে তারা হতবাক হয়ে গেল। বিচারক এবং লোকটি বলল, তাহলে আমাদের আদালতে নিয়ে এলেন কেন? তিনি বিচারককে বললেন, আমি আপনার কাজের ওপরে হস্তক্ষেপকারী হতে চাই না। আবার আমি এমন একজন ব্যক্তি, যে কিনা একজন সাধারণ লোকের সাথে সামান্য অর্থের দ্বন্দ্বে তার সমপর্যায়েও যেতে পারি না। এরপর তিনি ওই ব্যক্তিকে অর্থ দিয়ে দেন

এবং সে চলে যায়।

তিনি 'দারুল আদল' (ন্যায়সভা) নামে একটি বিচারবিভাগ খুলেছিলেন, যেখানে একজন ইহুদি একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে, একজন মুসলমান ইহুদির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

আমাদের জন্য সে সকল মহান সুলতান ও আমির-ওমারার আলোচনা করাই যথেষ্ট, যাদের হাত দিয়ে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন করেছেন। ইতিহাস তাদেরকে অমর হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে। যেমন সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ শহিদ, আল্লাহ তাআলা যার মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহকে জীবিত করেছেন, দ্বীনের পথনির্দেশক স্থাপন করেছেন, তার তরবারির আঘাতে ক্রুসেডারদের কোমর ভেঙে দিয়েছেন।[৯]

ঐতিহাসিক আবু শামাহ মাকদিসি তার রচিত *আজহারুর রাওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নুরুদ্দিন মাহমুদ যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন তার দেশ সব দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল। রাজ্যের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা দেশের এই খারাপ অবস্থাকে সংস্কারের ক্ষেত্রে কী করা উচিত তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিল। তারা ভেবেছিল, অপরাধীদের অপরাধ বৈধভাবে প্রমাণিত হলেই শুধু শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু এটা তাদের দমন করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তারা চিন্তা করল, তাদেরকে এমন কিছু রাজনৈতিক কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যেন জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়, পাশাপাশি অবস্থারও পরিবর্তন হয়। তাই তারা মসুলের প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ উমর মোল্লা মাওসুলির কাছে যায়, যেন তিনি তাদের এই বিচক্ষণ পরামর্শ সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের কানে পৌঁছে দেন। যেহেতু শাসনভার গ্রহণের আগে থেকেই সুলতানের সাথে শাইখ উমর মোল্লার দ্বীনদারি ও ইলমের কারণে বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল, সুলতানের অন্তরে শাইখের বিশেষ মর্যাদা ছিল, তাই তারা শাইখের কাছেই এই ব্যাপারটি নিয়ে গেল। শাইখ পরামর্শকদের কথা রাখলেন। তিনি তখনই সুলতান নুরুদ্দিনের কাছে এ বিষয়ে পত্র লেখেন। তাতে তিনি তাকে অসিয়ত করেন, যেন অপরাধীগোষ্ঠী অপরাধ করা মাত্রই শরয়িভাবে তাদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষা না করে তাদেরকে মারধর করা হয়। সুলতান শাইখের এই পত্রটি পেয়ে তা পড়ার পর পত্রের পেছনে তার মহিমান্বিত হস্তে একটি কথা

---

৯. *আর-রাজুল ওয়াত-তাজরিবাহ*, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল।

লিখলেন।

তিনি লিখলেন, কাউকে তার অপরাধ শরয়িভাবে প্রমাণিত হওয়ার আগে শাস্তি দেওয়া থেকে আমি দূরে অবস্থান করি। পাশাপাশি কারও অপরাধ এভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরে তার দণ্ড লঘু করে দেওয়া থেকেও আমি দূরে অবস্থান করি। আপনি আমাকে যে অসিয়ত লিখে পাঠিয়েছেন সেটাই যদি আমি প্রচলন করি তবে আমি ওই ব্যক্তির মতো হয়ে যাব, যে তার নিজের বিবেকবুদ্ধিকে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের ওপর প্রাধান্য দেয়। যদি আল্লাহ তাআলার বিধান বান্দার বিষয়াবলি সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট না হতো তবে আল্লাহ তাআলা উক্ত বিধান দিয়ে তার শেষ নবীকে প্রেরণ করতেন না।

এরপর তিনি তা শাইখের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শাইখ উমর মোল্লা আল-মাওসুলি যখন রাজকীয় সিলমোহরসংবলিত চিঠিটি দেখলেন, তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হায় আফসোস! এ কেমন হতাশাজনক ব্যাপার, যে কথাটি আমার বলা কর্তব্য ছিল তা সুলতান নিজেই বললেন!

এরপর পুরো বিষয়টি ঘুরে গেল এবং এখানেই আড়াল পড়ে গেল। শাইখ তার এই অসিয়তের কারণে তওবা করলেন। তিনি প্রচুর অনুতপ্ত হলেন। অন্যদিকে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি শরিয়ত অনুযায়ী অক্ষরে অক্ষরে পরিচালনা করতে লাগলেন। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ফেতনা-ফ্যাসাদ দূর হয়ে গেল। জননিরাপত্তা এতটাই নিশ্চিত হলো যে, একজন সুন্দরী মহিলা একাকী দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মূল্যবান গয়নাগাটি ও ধনরত্ন নিয়ে ভ্রমণ করেছিল, কিন্তু তাকে খারাপভাবে স্পর্শ করার কারও সাহস হয়নি। তার গয়নাগাটি ও ধনরত্ন ছিনিয়ে নেওয়ার চিন্তাও কেউ করেনি।

এই মহান শাসক সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের হাত ধরে যে মূল্যবান সংস্কারগুলো হয়েছিল তা ইতিহাস সংরক্ষণ করে রেখেছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লিপিবদ্ধ আছে। তিনি মিশর ও শামের ভূমি থেকে ক্রুসেডার শত্রুদের তাড়িয়েছিলেন, এ কারণে তার শাসনামলও খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের সাথে মিল রাখে।[১০]

---

১০. *মাকালাতে কাওসারি*, ৩২০-৩৩১।

জনগণকে ইবাদতমুখী করার প্রচেষ্টা

তিনি তার অধিভুক্ত অঞ্চলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ইহুদিরা যখন মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় মেতে ওঠে, তখন তিনি তার যোগ্য শিষ্য সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে গড়ে তোলেন। কারণ মুসলমানের রক্ত আমাদের কাছে মূল্যবান, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। ঠিক এ কারণেই ইমাদুদ্দিন তার ছেলে নুরুদ্দিন জিনকিকে এবং তিনি তার শিষ্য সালাহুদ্দিনকে গড়ে তুলেছিলেন। বস্তুত একজন বীরই শুধু আরেকজন বীর তৈরি করে থাকে।

তিনি তার স্ত্রী-পরিবারকেও সেভাবে গড়ে তুলেছেন যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন। একদিন তিনি তার স্ত্রীকে খুব কাঁদতে দেখেন, তখন তিনি তার কাছে এর কারণ জানতে চান। তার স্ত্রী উত্তরে বলেন, তার তাহাজ্জুদের নামাজ ছুটে গেছে তাই তিনি কাঁদছেন।

প্রিয় পাঠক, সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ রহ.-এর স্ত্রীর সাথে আমাদের বর্তমান নারীদের অবস্থা মিলিয়ে দেখুন। আমাদের নারীরা কান্নাকাটি করে পোশাকের জন্য। ভালো আবাসের জন্য। দামি গাড়ির জন্য। এমনকি আমাদের মধ্যে যারা দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করেন তাদের স্ত্রীরাও তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকে না। তারা অভিযোগ দেয় যে, তিনি তাদেরকে সময় দেন না, তাদেরকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যান না, বেশিরভাগ সময়ে বাড়ির বাইরে থাকেন। আল্লাহর কসম! তারা নুরুদ্দিন জিনকির স্ত্রীর মতো নয়।

অথচ এই মহিলা কাঁদছিলেন এ কারণে যে, তিনি একটি রাতের নামাজ আদায় করতে পারেননি। স্বামী-স্ত্রী আলোচনা করছিলেন নামাজ ছুটে যাওয়া নিয়ে। অথচ আমাদের স্ত্রীরা আলোচনা করে বাড়ি-গাড়ি, ধনদৌলত, গয়নাগাটি ইত্যাদি নিয়ে। আর তারা আলোচনা করতেন আমরা কীভাবে এই উম্মাহকে রাত জাগার প্রশিক্ষণ দেবো তা নিয়ে!

তিনি পাহাড়ের চূড়ায় মিজমা নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হওয়ার ঠিক আগে, যখন ফেরেশতারা নেমে আসে, তখন সেখানে আগুন জ্বালানো হতো, যাতে সবাই জেগে ওঠে এবং তাহাজ্জুদ আদায় করে। তিনি তা স্থাপন করেছিলেন জনগণকে রাতে সালাতে অভ্যস্ত করানোর জন্য। তিনি উম্মাহকে সেভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এটাই ছিল এই

মহানায়কের কর্মকাণ্ড। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন এবং এই উম্মাহকে তার অনুসরণ করার তাওফিক দিন।

সুলতানের আরও বৈশিষ্ট্য ছিল, তাকে কখনোই নামাজে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি, বা জামাতে নামাজের জন্য দেরি করতে দেখা যায়নি। তিনি এমন লোক নন, যিনি শুধু তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাই তো আমরা তার মতো হওয়ার কথা ভাবার আগেও বহু প্রাক-অনুশীলন করতে হবে। আমাদের অনেকেই জামাতে নামাজ আদায় করি না। এমনকি মসজিদের পাশে বসবাস করা সত্ত্বেও আমরা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করি না। যদি আমরা ইবাদতের সাথে অভ্যস্ততা গড়ে তুলতে না পারি তবে আমরা কীভাবে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির সমকক্ষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলব?

তারপরেও আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ইলমের হালকা গড়ে তুলছি। মানুষকে শরিয়তের বিধিবিধান ও ফিকহ শেখাচ্ছি। ইসলামের মহানায়ক ও কিংবদন্তিদের জীবনী আলোচনা করছি। এবং এর মাধ্যমে আশা করছি আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্য থেকে নুরুদ্দিনের মতো কাউকে বের করে আনবেন। আল্লাহর কসম! এটাই আমাদের আশা।

যদি তা নাও হয় তবুও আমি আশাহত হই না। কারণ একদিন আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। আমার কবরে শুয়ে থাকব। শাস্তির ফেরেশতারা এসে বলবেন, আল্লাহ তাআলা তোমার শাস্তি মাফ করে দিয়েছেন। আমি তাদের কাছে জানতে চাইব, কেন আমার শাস্তি মাফ করে দেওয়া হয়েছে? তারা বলবে, তোমার অমুক ছাত্র সুলতান নুরুদ্দিনের মতো হয়েছে। তুমি তার শিক্ষক হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তোমার পুরস্কার বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তোমার শাস্তি মাফ করে দিয়েছেন।

এটাই আমরা চাই। এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা এমন শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে কেউ যখন আমাদের একজন মহিলার সাথেও নোংরামি করবে, তবে আমরা তাদের দেশসুদ্ধ ধ্বংস করে দেবো! এই গ্রহের সব মুসলমানের মধ্য থেকে কোনো একজন মুসলমানের এক ফোঁটা রক্ত পড়লে আমরা তাদের এমন একটি শিক্ষা দেবো, যা তারা কখনো ভুলবে না! যেমনটি কবি আল্লামা ইকবাল তার একটি কবিতায় বলেছিলেন, 'যখন তারা করত'—এই অংশে তিনি তার সময়ের কথা বলছেন। আল্লামা ইকবাল ষাটের দশকে ছিলেন। তিনি বলছেন, কীভাবে

শত্রুরা মুসলিম উম্মাহকে ভয় পেয়েছিল। তিনি অতীতের সাথে তুলনা করে বলেছেন—

যখন কেউ এসে আমাদের সাথে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করত, বা মনে করত টক্কর দিতে পারবে,
আমরা আমাদের পা তুলে তাদের পায়ে পা রাখতাম।

এরপর তিনি বলেন,

وآلمني وآلم كل حر

سؤال الدهر : أين المسلم

কালের জিজ্ঞাসা—'মুসলমান কোথায়?'
এই তো আমার সাথে যাতনা সব স্বাধীন সত্তার।[১১]

বিশ্বের নেতৃত্বদান এবং ইহুদি-খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করার কথা ছিল মুসলমানদের। কিন্তু আজ তারা কোথায় চলে গেল? এটিই আমাদের কর্তব্য, আর যদি আমরা না পারি তবে তা আমাদের সন্তানদের দায়িত্ব।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. বাইতুল মাকদিস বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি তার সমস্ত কাঠমিস্ত্রিকে জড়ো করে কাঠ দিয়ে একটি বিশাল মিম্বার তৈরি করতে বলেছিলেন। তিনি ছিলেন হালাবে। এবং হালাব ও আকসার মাঝে ছিল বিশাল দূরত্ব। এরপরেও তিনি সবচেয়ে বড় মিম্বার তৈরি করার আদেশ দেন। সেই মিম্বার যাবে আকসায়, তিনি মুজাহিদগণের মাঝে এই আশা জাগিয়েছিলেন। লোকজন তাকে নানান কথা বলেছিল। তারা আকসা বিজয়ের কোনো সম্ভাবনাই সুলতান নুরুদ্দিনের মাঝে দেখতে পায়নি, যেমন নুহ আ. যখন জাহাজ তৈরি করছিলেন তখন সবাই তাকে পাগল বলে ডাকত। যখনই লোকেরা নুহের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা বলে উঠত—ওহে নুহ, তুমি কাঠের জাহাজ তৈরি করছ এবং এটি তোমাকে নিরাপদ রাখবে?

সুলতান নুরুদ্দিনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এবং তিনিও সেভাবে তাদের উত্তর দিয়েছিলেন, যেভাবে নুহ তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, যদি তোমরা আমাদের উপহাস করো, আমরাও তোমাদের সাথে ঠাট্টা করব, যেমন তোমরা

---

১১. উল্লেখ্য, এটি ইকবালের কবিতা নয়, হাশেম রিফায়ির কবিতা। (অনুবাদক)

আমাদের উপহাস করেছিলে।

তিনি একটি বিশাল মিম্বার তৈরি করলেন, এবং যারাই এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সকলেই বলছিল—এই বিশাল সুন্দর মিম্বার কীসের জন্য?

এই মিম্বার ছিল বাইতুল মাকদিসের জন্য। তার যোগ্য শিষ্য সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. যা পরবর্তীকালে আকসায় স্থাপন করে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছিলেন। সেই মিম্বার দামেশকে ৪৫ বছর ধরে অক্ষত ছিল। আল্লাহ তাআলা সুলতানের কবরে বর্ষণ করুন রহমতের অজস্র বারিধারা। আমাদেরকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক দিন। আমিন। আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝেও এমন বীর ব্যক্তি তৈরি করে দিন, যার উম্মাহবোধ এই উম্মাহকে পুনরায় জাগিয়ে তুলবে।

আকসা পুনরুদ্ধারকারী

বীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.

কুরআনে বর্ণিত পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধার

যে ভূমিতে মসজিদুল আকসা অবস্থিত তা পবিত্র। আল্লাহ্ এই পবিত্র ভূমিতে বরকত রেখেছেন। কুরআনে যতবারই পবিত্র ভূমির নাম উল্লেখ করা হয়েছে বা খুঁজে পাওয়া যায়, তা মূলত এই পবিত্র ভূমিকেই বিশেষায়িত করেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া-তাআলা এই পবিত্র ভূমিতে বরকত ঢেলে দিয়েছেন। যেমন তিনি কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ.

> হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্ধারণ করেছেন সেখানে প্রবেশ করো এবং পিছু হটো না, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।[১২]

আয়াতটিতে 'হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো' বাক্য দ্বারা যা বলা হয়েছে তা মূলত আকসার ভূমি। ফিলিস্তিন এবং বাইতুল মাকদিসকে সমগ্র কুরআনে পবিত্র ভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

---

১২. সুরা মায়েদা : ২১।

আর ফিলিস্তিনের মুক্তির সূচনা যিনি করেছিলেন তিনি উমর রা. নন, বরং এর মুক্তির সূচনাকারী ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তা মুতার যুদ্ধের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। আমরা যদি আমাদের ইসলামি শরিয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখি তবে আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারব যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো রোমান সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য ৩ হাজার সাহাবি পাঠিয়েছিলেন। সেই সময়ের পরাশক্তি, ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রক রোমানদের সাথে মাত্র ৩ হাজারের যে বাহিনী তাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তা ফিলিস্তিন অভিযানের প্রথম ধাপ ছিল। ফিলিস্তিনকে ফিরে পেতে তিনি এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় ধাপ হলো, তাবুকে তিনি রোমানদের সাথে যে যুদ্ধ করেছিলেন, সেটা। এই দুটি যুদ্ধ ছিল ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার সূচনা। তিনি ইসলামের বীর সেনানীদের দাঁড় করিয়েছেন। তবে আল্লাহর রাসুলের জীবদ্দশায় ফিলিস্তিন স্বাধীন হওয়া অপরিহার্য ছিল না। তাই তার হাতেই ফিলিস্তিনের বিজয় না হলেও তিনি ফিলিস্তিন বিজয়ের মহানায়কদের তৈরি করেছিলেন। এই দুটি অভিযান ছাড়াও তিনি আরও একটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মোট তিনবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমানদের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

তৃতীয় অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন উসামা ইবনে যায়দ রা.। আল্লাহর রাসুলের ওফাতের সময় উসামার বাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে ছিল। যে তিনটি যুদ্ধ আল্লাহর রাসুল শুরু করেন, সেগুলোই মসজিদুল আকসা পুনরুদ্ধারের পথকে সুগম করে। যার ধারাবাহিকতায় পরে ফিলিস্তিন বিজয় হয়। আমি (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল) সবসময় বলি, যে ফিলিস্তিনকে শাসন করবে সে বিশ্বকে শাসন করবে। রোমানরা যখন তা শাসন করেছিল, তখন তারা বিশ্ব শাসন করেছিল। ইহুদিরা আজ ফিলিস্তিন শাসন করছে, তারা আজ বিশ্ব শাসন করে। এ কারণেই আমাদেরকে পবিত্র ভূমি শাসন করতে হবে। কারণ আমরা এমন এক জাতি, যাদেরকে পৃথিবীর বুকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরপর আবু বকর রা. খেলাফতে এলেন। আবু বকর রা. আল্লাহর রাসুলের দেখানো পথে চললেন, তিনি আল্লাহর রাসুলের প্রেরিত বাহিনীকে না থামিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন। এ ছাড়াও তিনি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এবং উমর রা.-কে সমগ্র মুসলিমবিশ্বে নিজেদের শাসন বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে

অগ্রগামী করে দেন। তারা সমগ্র বিশ্বে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি যখন উসামার বাহিনী পাঠান তখন লোকেরা তাকে বলছিল,

: উসামার বাহিনী পাঠাবেন না, এতে বড় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা আছে।

কিন্তু তিনি বলেছিলেন,

: আল্লাহর কসম! আমি এই বাহিনী পাঠাবই, যেমনটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

তিনি একদিকে মুরতাদ এবং অন্যদিকে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তার অভিমুখী অভিযানে অনেকেই আপত্তি করেছিল। কিন্তু এগুলো সবই ছিল ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার পূর্বপদক্ষেপ। আবু বকর রা.-এর পর ইসলামের মহান খলিফা অর্ধ দুনিয়ার বাদশাহ উমর রা. শাসনভারের কেন্দ্রে আসেন। তিনি আবার আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে সেনাপতির পদে নিয়োগ দেন এবং তিনিই তাদেরকে আজকের ফিলিস্তিনে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। আবু উবাইদা আক্কা থেকে হাইফা হয়ে জাফফা পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসে ৩৫ হাজার সাহাবির বাহিনী নিয়ে পৌঁছে বাইতুল মাকদিস অবরোধ করে ফেলেন।

যখন খ্রিষ্টানরা ইসলামের ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয় তখন পুরোহিত ও জনগণ সবাই মুসলমানদের কাছে আসে। উমর রা. নিজে এসে মুসলমানদের পক্ষে আকসার চাবি গ্রহণ করার শর্তে তারা শহর ছেড়ে দিতে রাজি হয়। উমর রা. উপদেষ্টা সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি শর্ত মেনে নেব? তখন তারা সবাই একই মত দিলেন। এরপর উমর রা. তার উট ও ক্রীতদাস নিয়ে রওনা হলেন। তারা পালাক্রমে উটের পিঠে চড়ে মদিনা থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত যান। গুরুত্বপূর্ণ কাজ না হলে উমর রা. এত দূরত্ব অতিক্রম করতেন না। এগুলো ছিল এমন ভূমি যেখানে সাহাবা ও তাবেয়িন অঢেল রক্ত ঝরিয়েছেন। অথচ তাদের পরে ভীরুরা নির্লজ্জের মতো গাধা এবং শূকরের বংশধরদের হাতে এই পবিত্র ভূমি দিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম ও আপনাদের পূর্বপুরুষগণ এখানে রক্ত ঝরিয়েছেন। বলুন তো, যদি আমাদের জন্মদানকারী পিতা রক্ত ঝরিয়ে কোনোকিছু অর্জন করেন, তাহলে আমরা কি এত উদারভাবে তা কারও হাতে ছেড়ে দেবো? অথচ আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো লড়াই করতে হয় না, রক্ত ঝরাতে হয় না। আর যখন আমরা কোনোকিছু সহজভাবে পাই তখন তা ছেড়ে দেওয়াও সহজ হয়ে যায়। এবং এটিই আজ আমাদের প্রধান

সমস্যা। আমরা জিহাদ ত্যাগ করেছি। আবু বকর রা. বলেছেন, মহান আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি জিহাদ ত্যাগ করবে সে লাঞ্ছিত হয়ে যাবে। উমর রা. বলতেন, আল্লাহ আবু বকরের প্রতি রহম করুন।

তার বিখ্যাত উক্তি 'যে জিহাদ ত্যাগ করবে সে লাঞ্ছিত হয়ে যাবে'—আর আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি, আমরা শান্তি আলোচনা করতে ছুটে যাই, তাই আজ আমরা সকলের মধ্যে সর্বনিম্ন উম্মত হয়েছি।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন জেরুজালেমের চাবি গ্রহণ করার জন্য ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা দেন এবং বাইতুল মাকদিসে প্রবেশের আগে আবু উবাইদা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসেন, তখন তিনি দেখতে পান, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমরের জুতাজোড়ার একটি বুকে ঝোলানো এবং আরেকটি তার পিঠে। তিনি জুতাজোড়া কাঁধে নিয়েছিলেন। তিনি এমন একটি জামা পরিধান করেছিলেন, যার মধ্যে অজস্র সেলাই করা হয়েছে। যে উটে তিনি এবং তার দাস পালাক্রমে চড়ে আসছিলেন সে উটের পিঠ থেকে তিনি নেমে জুতাগুলো এভাবেই গলায় ঝুলিয়ে নেন। এরপর দাসের পালা হওয়ায় তাকে চড়িয়ে উটের লাগাম নিজ হাতে নেন। শহরের দরজায় পৌঁছে তিনি অগ্রসর হতে চান। কিন্তু আবু উবাইদা তাকে বাধা দেন। তিনি উমর রা.-কে বলেন,

: আমিরুল মুমিনিন, আপনি এ কী করছেন! জুতা গলায় ঝুলিয়েছেন! উটের লাগাম ধরেছেন! আর আপনার জামাকাপড় পরিবর্তন করুন। আপনার সাথে পুরোহিত, বিশপ এবং জনগণ সাক্ষাৎ করবে। তাই আপনার জামাকাপড় বদলান। আরও উপযুক্ত কিছু পরিধান করুন। যেন আপনি তাদের সাথে বসতে পারেন।

উমর রা. তা শুনে বললেন,

أوه! لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.

আহ! আবু উবাইদা! যদি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ এ কথা বলত, তবে আমি তাকে শিক্ষা দিয়ে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মাদির সামনে নজির স্থাপন

করতাম। আমরা লাঞ্ছিত মানুষ ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এখন আল্লাহ আমাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন, আমরা যদি তা অন্যকিছুতে খুঁজতে যাই, তবে আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন।[১৩]

হজরত উমর রা.-এর একটি উক্তি বিখ্যাত হয়ে আছে। তা হলো, 'এই পবিত্র ভূমি আমাদের অধিকৃত হয়েছে ঠিক, তবে আমরা এর মালিক নই।'

আমরা ইসলামের কারণে সম্মানিত জাতি। আমরা যদি জাতীয়তাবাদ বেছে নিই কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতা, অথবা জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ইত্যাদি সুপার পাওয়ারদের অনুগত হয়ে ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু আমাদের সম্মানিত করতে পারে বলে মনে করি, তবে আল্লাহ আমাদেরকে সর্বনিম্ন করে দেবেন। আর সেটাই আজ আমাদের সাথে ঘটেছে এবং ঘটছে।

যাই হোক, হজরত উমর রা. সসম্মানে খ্রিষ্টান নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ফিলিস্তিনের চাবি গ্রহণ করেন। চাবি গ্রহণকালে নামাজের সময় হয়। প্রিয় পাঠক, আপনার কী মনে হয়? হজরত উমর রা. কি এমন বলেছেন যে, 'এখন আমি গুরুত্বপূর্ণ সভায় আছি তাই নামাজ পরে পড়ব?' কস্মিনকালেও তিনি তা বলেননি, বরং বললেন, আমার এখন নামাজ আছে। আমি নামাজ আদায় করব। খ্রিষ্টান নেতা সম্মানের সাথে তাকে বললেন, উমর, আপনি চাইলে আমাদের গির্জায় নামাজ আদায় করতে পারেন।

কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এজন্য প্রত্যাখ্যান করেননি যে, গির্জায় নামাজ আদায় করা হারাম। বরং তিনি এজন্যই পড়েননি যে, কারণ তিনি খ্রিষ্টানদের এলাকায় ছিলেন। আর তিনি মনে করছিলেন, তিনি যদি গির্জায় নামাজ আদায় করেন, তাহলে পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ বলবে, উমর এই গির্জায় নামাজ আদায় করেছেন। তাই এই গির্জা আমাদের অধিকারভুক্ত। এটা একটা মসজিদ। তাই তিনি নামাজ আদায় করেননি; তিনি তাদের গির্জা তাদেরই রাখতে চেয়েছিলেন। কত মহান নেতা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা! আমাদের ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের মতো কেউ বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। জাতিসংঘও নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নয়, অন্য কেউও তেমন নেতৃত্ব দিতে পারেনি।

---

১৩. *মুসতাদরাকে হাকেম।*

আমরা মুসলমানরাই ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছি। তার আগে তারা জানতই না ধর্মের স্বাধীনতা বলতে কিছু আছে। আমরাই সেই কাজটি করেছি। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, কেউ যদি অন্য কোনো ধর্মকে অনুসরণ করতে চায় তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বেছে নিলে জাহান্নামে যেতে হবে। এই জীবনে আপনি খ্রিষ্টান হওয়া আপনার দায়দায়িত্ব। আমরা তরবারির জোরে কাউকে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে বাধ্য করি না। যদিও বিশ্বকে অবশ্যই 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর শাসনের অধীনে থাকতে হবে। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অধীনে আপনার খ্রিষ্টান হওয়ার অধিকার রয়েছে, আপনার ইহুদি হওয়ার অধিকার রয়েছে।

বাইতুল মাকদিসের চাবি গ্রহণের পর হজরত উমর রা. সবাইকে তাদের অধিকার দেন এবং সবাই শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। মুসলিম উম্মাহও শান্তিতে বসবাস করত।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

সকল খলিফা এমনকি হারুনুর রশিদসহ সবাই শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। এমনকি খলিফা হারুনুর রশিদ খ্রিষ্টানদের গির্জা ও ইহুদিদের সিনাগগ সংস্কার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের গির্জাগুলোতে তারা তাদের ইচ্ছামতো উপাসনা করতে পারত। এভাবে আস্তে আস্তে দিন যেতে থাকে এবং উম্মাহ বিপথগামী হয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

আগে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আর আপনি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।[১৪]

সাধারণ দার্শনিকদের দর্শন আর আল্লাহর দর্শন এক নয়। দার্শনিকদের দর্শন

১৪. সুরা আহজাব : ৬২।

আমরা আবর্জনা জ্ঞান করি, কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, আল্লাহর সুন্নাহ চলে এবং যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের প্রায় ৪৯০ বছর পর উম্মাহর অবস্থা আজকের মতো হয়ে গিয়েছিল। সবাই ক্ষমতা চাইত যেমনটা আমরা গতকাল আলোচনা করেছি। প্রত্যেকেরই এই পৃথিবীর একটি ছোট অংশ আছে, ছোট পাড়া আছে এবং সে নিজেকে খলিফা, সুলতান এবং রাজা মনে করে। একটা ক্ষুদ্র শহরেও সবাই সেই শহরের নেতৃত্ব চায়। সবাই সম্পদ চায়। সে সময়ও তা-ই হয়েছিল। ইসলাম নিয়ে চিন্তা সবাই তাদের পেছনে ফেলে রেখেছিল। আজকের আলোচ্য মহানায়কই কেবল এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি ছিলেন গতকালের আলোচ্য মহানায়ক নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর হাতে গড়া শিষ্য, যাকে গড়েছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকি। গতকাল আমরা জেনেছি, সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. একটি বড়সড় মিম্বার তৈরি করিয়েছিলেন। এই মিম্বার তিনি সিরিয়ার দামেশকে প্রস্তুত করেন। ফিলিস্তিন ছিল সিরিয়া থেকে অনেক দূরে। তিনি সিরিয়ায় এটি নির্মাণ করেন এবং বলেন, এই মিম্বারে উঠে আমরা আকসাতেই খুতবা দেবো।

প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য এভাবেই রাখতে হয়। আমরা লক্ষ্য নির্ধারণ করব এভাবে যে, আমরা আকসায় নামাজ পড়তে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, আমাদের জীবনে ইহুদিদের নোংরামি ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি অত্যাচার থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার সময় আসবে।

বীরদের নির্লোভ জীবন

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. এক দিনার এবং ৪০ দিরহাম রেখে আখেরাতের সফর শুরু করেছেন। লক্ষ করুন, সুলতান সালাহুদ্দিন যখন ইনতেকাল করেন এবং যখন তার পরিবার-পরিজন তার আলমারি খুললেন, তারা দেখলেন তার সম্পদ ছিল এক দিনার এবং ৪০ দিরহাম। অথচ তার ১৬ জন সন্তান ছিল। এক দিনার আমাদের সাধারণ আলমারিতে কয়েকটি মুদ্রা রাখার মতো। কিন্তু তিনি কি এতই সাধারণ ছিলেন? এতই গরিব ছিলেন? অবশ্যই নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন এমন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যিনি তার লাভ, খ্যাতি নিয়ে চিন্তা করেননি। নিজের জন্য কিছুই করেননি। আমাদের চোখে তিনি মহান সালাহুদ্দিন হয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু নিজের চোখে তিনি

ইসলামের জন্যই বেঁচে ছিলেন। কারণ তার পিতা তাকে এই চিন্তার ওপরেই লালনপালন করেছেন। তার পিতা ইমাদুদ্দিন তাকে সেভাবেই বড় করেছেন। তার চাচাও একইভাবে তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি ইসলামের এক মহান বীর, যিনি সেনাবাহিনীকে বিজয়ের দিকে পরিচালিত করেছিলেন।

আমরা গতকাল সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর কথা বলেছিলাম। সুলতানের মতো নিষ্কলুষ ব্যক্তি ছিলেন বলেই সালাহুদ্দিনের মতো বীর তৈরি হয়েছে। তো তার সম্পদ ছিল এক দিনার ৪০ দিরহাম। ওয়ারিশ ছিল ১৬ সন্তান। হজরত উমরের পর তাকে ফিলিস্তিন ইস্যুতে উমরের উত্তরসূরি জ্ঞান করা হয়। যিনি উম্মাহর জন্য ভাবতেন, সন্তানের জন্য না ভেবে। হজরত উমর রা. একবার তার ছেলেকে মাংস খেতে দেখে তাকে চড় মেরে বললেন, যাও, বের হয়ে যাও এখান থেকে! তুমি মাংস খাচ্ছ কেন?

ছেলে ভয়ে চলে গেল। তারপর বাবা শান্ত হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলে, বাবা, মাংস খেলে কী ক্ষতি হয়?

তিনি বললেন, এর কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তুমি সবসময় নিজের ইচ্ছা পূরণ করো না। সবাই যখন ক্ষুধার্ত তখন খলিফার ছেলে মাংস খেতে পারে না।

একবার তিনি তার পৌত্র হজরত হাফসা রা.-এর শিশুপুত্রকে নতুন পোশাক পরে বেশ গর্ব করে করে ঘুরে বেড়াতে দেখেন। একজন মহান খলিফার পৌত্র নতুন পোশাকে বড়াই করতে পারে, এটা খলিফা মানতে পারলেন না। তিনি তাকে প্রহার করতে শুরু করেন। হজরত হাফসা পিতার কাছে জানতে চাইলেন, সে কী করেছিল? সে কি কোনো বড় অপরাধ করেছে?

তিনি বললেন, আমি তাকে নতুন পোশাক প্রদর্শন করতে দেখেছি। খলিফার ছেলেরা এমন করে দেখাতে পারে না।

হ্যাঁ, এমনই ছিলেন আমাদের মহান নেতা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তিনি তো সেই ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত থাকার কারণে যার পাকস্থলীতে গুড়গুড় শব্দ হতো। মদিনায় তখন খরা চলছিল। কোথাও কোনো খাবার নেই। তিনি নিজেকে বলেছিলেন, পেট যত খুশি শব্দ করো। মহান আল্লাহর কসম! তুমি ততক্ষণ খাবার পাবে না, যতক্ষণ না সমস্ত উম্মাহ খেতে পায়।

এটাই ছিল তার স্বকীয়তা। যখন আমরা বলি, আমরা সাহাবি ও তাবেয়িদের

বংশধর, তখন আমরা তাদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ দ্বারাই তাদের বংশধর বলতে চাই। আমরা সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বংশধর। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি অনারব ছিলেন। এটি মনে রাখবেন। যারা আরবি ভাষায় কথা বলে তাদের জন্যই আল্লাহকে বিজয় দান করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আরবদের কাছেই বিজয় আসতে হবে, তা জরুরি নয়। ইসলামের বিজয় আনতে আল্লাহর কাউকে প্রয়োজন নেই। তিনি 'হও' বলে ইসলামকে বিজয়ী করতে পারতেন এবং তা বললেই হয়ে যাবে। সুতরাং, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন। বরং ইসলামের বিজয় অর্জনের জন্য নির্বাচিত হওয়া আমাদের জন্যই গৌরবের বিষয়। এটা আমার-আপনারই ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধির মাধ্যম।

আল্লাহ্ বলতে পারতেন, 'ইসলাম তুমি সবার ওপর বিজয়ী হও'—এবং তা হবেই। কিন্তু এটা আমাদের সম্মানের বিষয় যে, আমরাই ইসলামকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করতে পারি, এমন পন্থা খুঁজে বের করব। কারণ ইসলাম আমাদের মুখাপেক্ষী নয়, আল্লাহ্ও নন। বরং আমরাই ইসলামের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.

> আর আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী এবং তোমরাই মুখাপেক্ষী। আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারপর তারা তোমাদের মতো হবে না।[১৫]

উত্তম স্থলাভিষিক্তজন হবেন হজরত সালমান আল-ফারসি রা.-এর মতো। তিনি একজন পারসিক অনারব ছিলেন। সাহাবিরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তি কে? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ফারসিকে জড়িয়ে ধরেন। তো আল্লাহ ও তার রাসুলের কাছে একজন অনারবও চূড়ান্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। আরবরা যদি ইসলামকে নীচু করে তাহলে আমরা আমাদের ভারতীয় মুসলিম ভাইদের পানে চেয়ে আছি ইসলামকে উত্থাপন করার জন্য। আরবরা

---

১৫. সুরা মুহাম্মাদ : ৩৮।

যদি ইসলামকে নীচু করে তাহলে আমরা আমাদের তুর্কি ভাইদের বীরত্বের প্রতি আশা রাখতে চাই। আরবরা যদি ইসলামকে নীচু করে তাহলে আমরা আমাদের বসনীয়, ভারতীয়, পাকিস্তানি মুসলিমসহ আমাদের ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের কাছে আশা রাখি তারাও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মতো অনারব হয়েও ইসলামের ঝান্ডা উন্নীত রাখবেন।

মহাবীরের জন্ম

আরবরা যখন ইসলামের মানমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছিল, তখন এই মহান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। আর তিনি একজন কুর্দি ছিলেন। তিনি একটি সামরিক ঘাঁটিতে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আধুনিক ইরাকের তিকরিতের কাছে একটি সামরিক ঘাঁটিতে জন্মগ্রহণ করেন। এখান থেকেই বোঝা যায়, একজন মানুষ যখন তার চারপাশে বীর সৈনিকদের মাঝে জন্মগ্রহণ করে, সে তো নিজেও একজন মহানায়ক হবেই। তার চাচা ও বাবা ছিলেন জেনারেল এবং কমান্ডার। তাদের মধ্যে ইনসাফও ছিল। একদিন এক মহিলা তার চাচার কাছে এসে তার চাচাকে বললেন, আপনার একজন সৈন্য আমাকে ধর্ষণ করেছে। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করতে উক্ত সৈনিককে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ধর্ষণ করেছে? সৈনিক বলল, হ্যাঁ। এ কথা শোনামাত্রই তিনি তার তলোয়ার নিয়ে সৈনিকের গলা কেটে ফেললেন। অথচ সে তার সৈন্যদেরই একজন ছিল। কিন্তু তিনি স্বজনপ্রীতি দেখাননি। কারণ মুসলিম সেনাবাহিনীতে দুর্নীতি করা উচিত নয়। যেহেতু এই লোকেরা ইসলামের বিজয় আনতে চলেছে। আর যখন মুসলিম বাহিনীতে গুনাহ্ সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ পুরো সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেবেন। এমনকি গোটা দুনিয়াও এমন পাপের কারণে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিতে পারেন।

যাই হোক, সেনাহত্যার পর ওই এলাকার নেতা বা সুলতান বললেন, আমি আপনার সঙ্গে আছি। আপনার কাজ সমর্থন করছি। আপনি যা করেছেন তা আমি অপছন্দ করি না। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। এই সৈনিকের বড় পরিবার আছে এবং তারা প্রতিশোধ নিতে আসতে পারে। আপনি এখানে নিরাপদ নন। আপনি আপনার ভাই ইমাদুদ্দিনকে নিয়ে চলে যান।

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের প্রায়

৫২৩ বছর পর সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চাচা সেই মহিলার অধিকারের প্রতিশোধ নেওয়ার দিনেই মহান সুলতান সালাহুদ্দিনের জন্ম হয়। তার জন্মও নবী-রাসুলগণের মতো সম্মানিত দিনেই হয়। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেদিন আল্লাহ তাআলা আবরাহার হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন। সহিহ হাদিস অনুসারে এই ঘটনা সত্য। আল্লাহ তাআলার কুদরত দেখুন! যেদিন তার চাচা প্রতিশোধ নিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন, সেদিনই তার জন্ম হয়। এই ব্যক্তির বংশধর থেকে জন্ম নেওয়া শিশুটিই পরবর্তীকালে মহানায়ক হতে চলেছে, যার কথা আমরা আজ শুনছি।

তো এরপর সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চাচা হালাবে গিয়ে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির বাহিনীতে যোগ দেন। সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির তত্ত্বাবধানে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি বেড়ে ওঠেন। জ্ঞানে, সমরবিদ্যায়, ইবাদতে, সবকিছুতেই সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির প্রভাব ছিল সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মাঝে।

আইয়ুবি বংশলতিকা
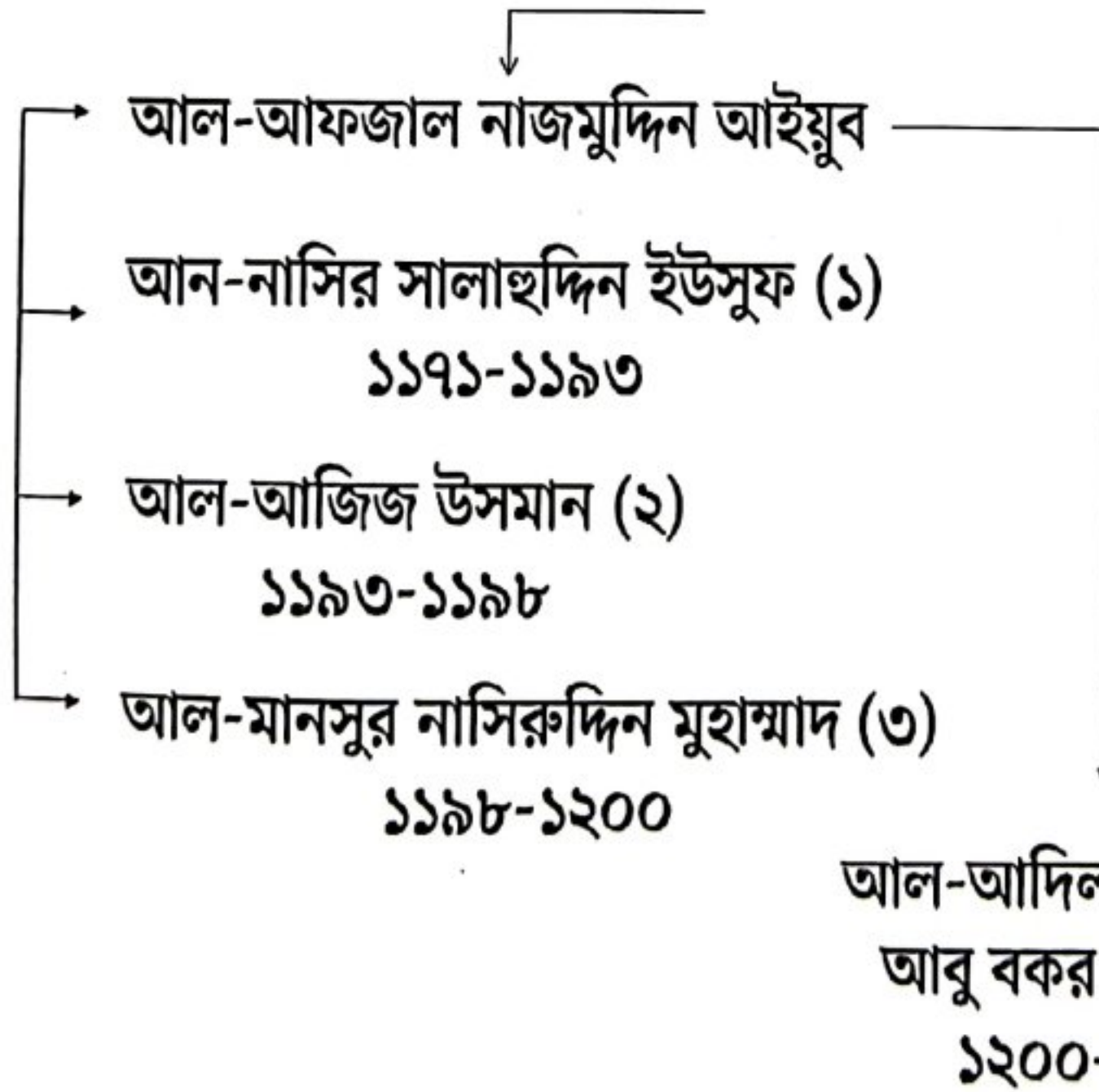
সামরিক নৈপুণ্যের ঝলক

মিশরের ওপর আক্রমণ হলো। মিশর তখন সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির অধীনে শাসিত হচ্ছিল। এই আক্রমণ করে ফাতেমি ও শিয়া গোষ্ঠী। বহিরাগত এই বাহিনী মিশরে আক্রমণ করে। সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি আহলুস সুন্নাহকে রক্ষা করার জন্য কিশোর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং তার চাচাকে পাঠান। তারা গিয়ে শিয়াদের ওপর আক্রমণের মাধ্যমে মিসরকে রক্ষা করেন এবং তাদের ওপর বিজয়ী হন। অতঃপর সিরিয়ার এক শাসক মিশরের কর্তৃত্ব অর্জন করতে চাইলে চাচা সালাহুদ্দিনকে বলেন, তুমি মিশর এলাকা দেখভাল করো, আমি ইসলামের ভূমিকে প্রসারিত করতে সামনে অগ্রসর হতে যাচ্ছি।

প্রিয় পাঠক, তখনকার মুনাফিক আমিরদের চিন্তাধারা কল্পনা করুন। একটুমাত্র ভূমির মালিক হয়ে তারা নিজেদেরকে রাজা ভাবত। তাই তো তারা মিশরকে হস্তগত করতে চাইত। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তখন মিশরের শাসনভার হাতে নিয়েছেন। তার চাচা তাকে দায়িত্ব দিয়ে শহরের পর শহর পাড়ি দিচ্ছেন। এ সময় ক্রুসেডার, রোমানরা আবারও ফিরে এসে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ওপর

চেপে বসে তার চাচার অনুপস্থিতির সুযোগ নেয়। কিন্তু তিনি অবিচল থাকেন। যুদ্ধ করতে করতে সুলতান এবং তার সৈন্যদের রসদ ফুরিয়ে যায়। তারা গাছের পাতা খেয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। খাবার নেই, পানি নেই, কিন্তু তারা শেষ দম পর্যন্ত লড়ার সিদ্ধান্তে অনড়। সুলতানের চাচা খবর পেয়ে দ্রুত পিছিয়ে আসেন। তার চাচার ফিরে আসার খবর পেয়ে রোমানরা পালিয়ে যায়। এমন বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ও অবিচলতার কারণে মিশরবাসী সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও তার চাচাকে ভালোবেসে ফেলেন। এবং তারা তাকে সেখানকার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। এমনকি ইসলামবিদ্বেষী ফাতেমি, শিয়া জনগোষ্ঠীও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে শাসক হিসেবে বেছে নেয়, যাদের ক্ষেত্রে সকল গ্রহণযোগ্য আলেমের মত হলো, তারা সুস্পষ্ট কাফের। তারা সবাই বিপথগামী, বরং অন্যদের তুলনায় আরও বিচ্যুত। কিন্তু তারাও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির অধীনে শাসিত হওয়া পছন্দ করল।

যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি গভর্নর হয়ে মুসলিম উম্মাহর সুরক্ষায় নিয়োজিত হয়ে পড়েন। সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ.-এর দেখানো পথ অবলম্বন করে তিনিও মিশর থেকে বিদআত এবং সুন্নাহপরিপন্থী কাজ দূরীকরণ অভিযান শুরু করেন। তিনি মিশরে শাসন করতে এসে দেখেন এখানকার শিয়ারাও 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' বলে। তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার আদেশ জারি করেন। এভাবেই তিনি যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্যে পরিণত হন।

বর্তমান যে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, তখন তা পুরোপুরি শিয়ারা নিয়ন্ত্রণ করত। সেখানে কর্তৃত্ব ছিল শিয়া আলেমদের। শিয়ারা সেখানে বসেই মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করত। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার লক্ষ্যে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন।

তার চারপাশ রোমান, ক্রুসেডার, মুনাফিক দ্বারা ভরতি ছিল। শিয়া নিয়ন্ত্রিত আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ফেতনা ও নোংরামি ছড়ানোর সুযোগ তিনি বহাল রাখেননি। এ কারণে শিয়ারা তার ওপর বেশ ক্ষুব্ধ ছিল। তারা তার নামে অনেক মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে।
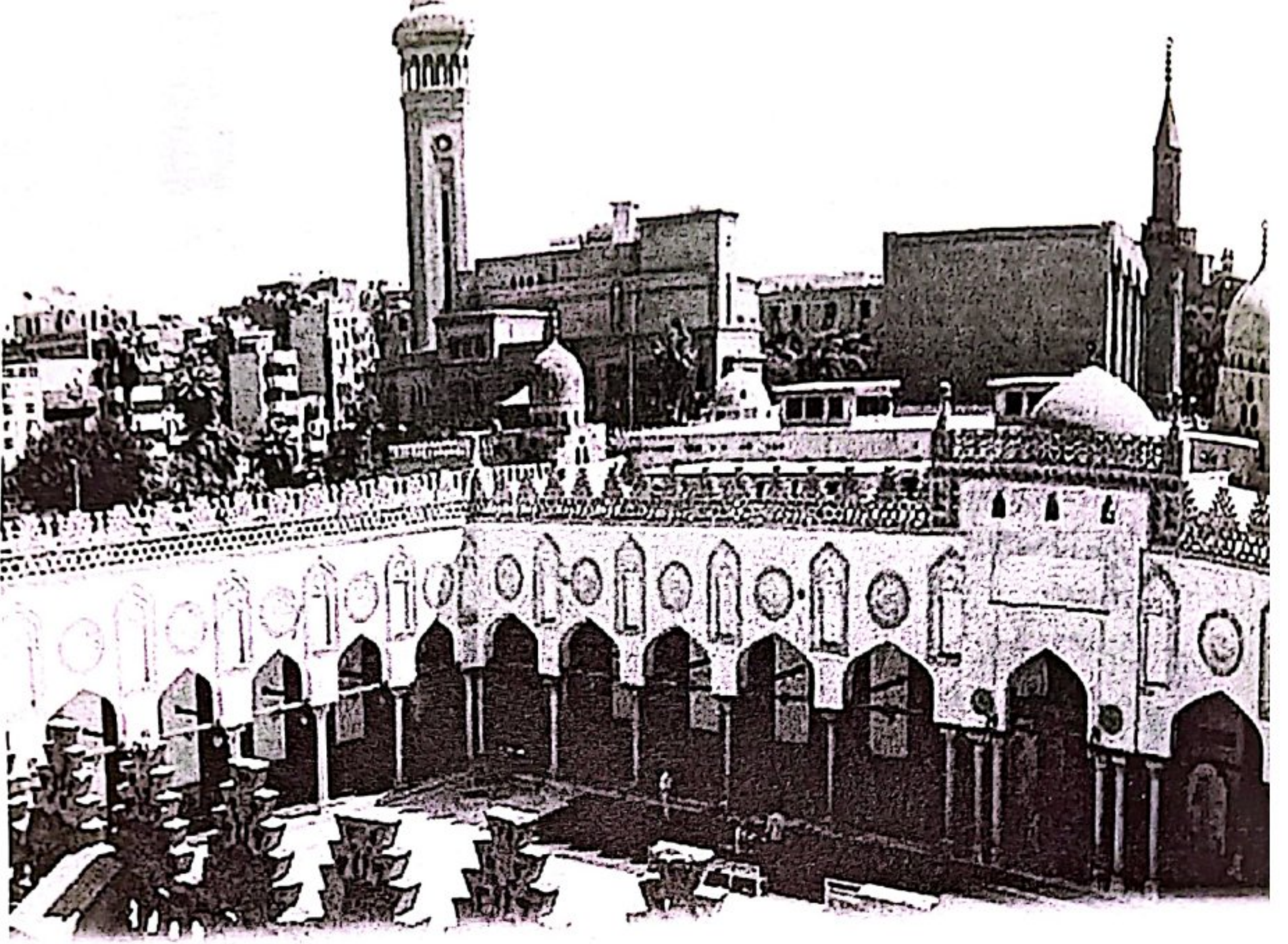
চিত্র : আল-আজহার

প্রিয় পাঠক, আপনাকেই বলছি! আপনি এই উম্মাহর একজন মহানায়ক মহান সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে নিয়ে অনেক মিথ্যা শুনে থাকবেন। এই শিয়ারা সুলতান সালাহুদ্দিন সম্পর্কে অনেক মিথ্যা প্রচার করে। তাই তার সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য, যেমন আমাদের সাহাবায়ে কেরামের সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। সুলতান শিয়া নিয়ন্ত্রিত আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে নতুন করে আহলুস সুন্নাহর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিল। এমন সময় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন সুলতান সালাহুদ্দিন। আল্লাহু আকবার! সুলতান কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলেন, তা তিনি নিজেই খুব ভালো করে জানতেন।

সুলতান সালাহুদ্দিনের নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে আরও বেশ কিছু কারণ ছিল। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইসলাম জানার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা একটি মুসলিম প্রজন্মকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এ কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ তাদের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের জন্য মুসলিম দেশগুলোসহ এমনকি আধুনিক মধ্যপন্থী কিংবা লিবারেল মুসলিম দেশগুলোর ওপরেও হস্তক্ষেপ করে। তারা

আধুনিকতাবাদী মিশরের কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠায়। এমনকি আজহারের ইসলামও আধুনিকতাবাদী। কিন্তু তারপরও ইসলামের গন্ধও তাদের জন্য বিপদ। তাই তারা মিশরকে চিঠি পাঠায়—আপনাদের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করুন।

মূলত ইসলামি পাঠ্যক্রম তাদের জন্য বিপদ, ইসলামি আকিদা তাদের জন্য বিপদ, ইসলাম সকল জালেমের জন্য বিপদ। শুধু মিশরে নয়, এমনকি তারা সৌদিতেও চিঠি পাঠিয়েছে—আপনাদের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের চিঠি পেয়ে সৌদির কয়েকজন মন্ত্রী পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে রাজি হলেন। কেউ কেউ অসন্তোষও প্রকাশ করলেন। কেন? কারণ আমরা মুসলমানদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা শেখাই। আমরা তাদের ওয়ালা ও বারা শিক্ষা দিই। ওয়ালা ও বারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। অথচ তারা মুক্তচিন্তার কথা বলে, জ্ঞানার্জনের কথা বলে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কথা বলে। অথচ দেখুন, এটি কেমন দেশ! যে দেশ জ্ঞানার্জনকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। কী বিচিত্র দেশ! তারা তো এমন চিন্তাধারার লোক, যাদের কার্যক্রম দেখলে আমাদের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আরবদেশগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে কোনো ঘরে ছোট পুস্তিকা পাওয়া গেলেও তাদেরকে জেলে নিয়ে যাওয়া হতো! তারা পারভেজ মোশাররফের কাছে গিয়ে তাকেও বলেছিল, কুরআন শেখার স্কুলগুলো বন্ধ করে দাও।

সর্বোপরি এসব কারণ তখনও বিদ্যমান ছিল, তাই সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি পরবর্তী প্রজন্মকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান পৌঁছানোর জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদেরকেও এমন একটি উম্মাহ গড়ে তুলতে হবে, যারা ইসলাম জানে। অবশ্যই মোশাররফ নতি স্বীকার করেছে, সৌদিরা স্বীকার করেছে, মিশর তাদের পাঠ্যক্রমের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ব নতি স্বীকার করেছে। কারণ ক্ষমতা বা সঠিক আজ তারটাই, যে শক্তিশালী বেশি। পক্ষান্তরে যে দুর্বল, তার কাছে সত্য থাকলেও কেউ তার কথা শোনে না। তাই তারা যা চেয়েছে অন্যরা সর্বদাই তা দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে।

সালাহুদ্দিন বিষয়টি জানতেন। তিনি ভাবতেন, আমাকে সঠিক আকিদাসম্পন্ন লোক খুঁজে বের করতে হবে। তার বাসভবনে নিয়মিত ফিকহের দরস হতো। ফিকহ, হাদিস, সিরাত নিয়ে আলোচনা হতো। সুলতান সালাহুদ্দিন

আইয়ুবিকে কল্পনা করতে গিয়ে আমরা হয়তো অনেকে ভাবি যে, একজন তলোয়ারধারী ব্যক্তি, যিনি সবসময় তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি জানতেন, কীভাবে কোনোকিছুর ভিত্তি তৈরি করতে হয়। তিনি নিজেই একটি ভিত্তির মতো ছিলেন। তার মধ্যে ইলম, ইবাদত, আকিদা—সবই ছিল। সামরিক শিক্ষাও ছিল তার। সামরিক নৈপুণ্য অর্জন সবচেয়ে সহজ কাজ। আল্লাহর কসম! এটি সর্বশেষ স্তর এবং সবচেয়ে সহজতম। তাই তিনি সেখানে অর্থাৎ মিশরে শিক্ষাদীক্ষা চালু করে দেন এবং আজহার বন্ধ করে দেন। তিনি কেবল শিয়াদের প্রোপাগান্ডামাধ্যম আজহার বন্ধ করে দেন, কিন্তু তিনি তাদের কাউকে হত্যা করেননি, এমনকি ফাতেমীয়রা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকলেও তিনি কখনোই তাদেরকে হত্যা করেননি।

তিনি তাদের হত্যা করে দমন করতে চাননি। তিনি শুধু তাদের পণ্ডিতদের প্রভাব খর্ব করার জন্য প্রজ্ঞার সাথে কাজ আদায় করেছিলেন। এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে, এই বিপথগামী বিশ্বাস কেউ ছড়াতে পারবে না, কেউ সাহাবায়ে কেরামকে অভিশাপ দিতে পারবে না, কেউ তাদের শাইখদেরকে আল্লাহর মতো কিংবা মাসুম ও নিষ্পাপ দাবি করতে পারবে না।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতকে জীবিত করতে আগ্রহী ছিলেন। উবাইদি শাসকেরা, যাদেরকে ফাতেমি মুসলমান বলা হয়, তারা সবকিছুতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিল। আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারীদেরকে হাদিস পড়া থেকে বিরত রেখেছিল। এমনকি তারা কতক মুহাদ্দিসিনে কেরামকে মিশর ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ফাতেমিরা সাহাবায়ে কেরাম রা.-কে গালিগালাজ করত এবং মানুষকে এসব গালিগালাজে উৎসাহিত করতে পুরস্কৃত করত। তারা বলত, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামকে অভিশাপ এবং গালি দেবে, তাকে দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও গম দেওয়া হবে!

এ ছাড়াও তারা দ্বীনের মধ্যে অনেক নিত্যনতুন বিষয় আবিষ্কার করেছিল। মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টাকে বিশৃঙ্খল করে রেখেছিল। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করলেন। হাদিসচর্চা ফিরিয়ে আনলেন। এমনকি তিনি তার সাথে সার্বক্ষণিক একজন আলেম রাখতেন, যিনি তাকে *সহিহ বুখারি* পড়াতেন। যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের তীব্রতা ও ভয়াবহতার মাঝেও

তিনি উক্ত আলেমকে তার সাথে রাখতেন।[১৬]

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. শিয়া পণ্ডিতদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন যে, একপর্যায়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে পালাতে শুরু করে। এ সময় তার চাচা ও সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি ইনতেকাল করেন। কিন্তু তার আগে তারা মিশর ও পূর্ণ সিরিয়া তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন। অবশ্য তারা খলিফা ছিলেন না। সালাহুদ্দিন আইয়ুবিও খলিফা নন। তারা ছিলেন নিছক গভর্নর। খেলাফত ছিল আব্বাসীয় খলিফাদের হাতে। কিন্তু তারা এতটাই দুর্বল ছিল যে, তাদের কিছুই করার ছিল না। তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তবুও যতবারই সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. তার বুদ্ধিমত্তা থেকে কিছু করেছেন, ততবারই তিনি আব্বাসীয় খলিফাকে চিঠি পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, আমরা এটা করব, নাকি ওটা করব?

নির্মোহ জীবনে ন্যায়পরায়ণতা

যদিও সুলতান সালাহুদ্দিনের এত সামর্থ্য এবং এত শক্তি ও ক্ষমতা ছিল যে, তিনি চাইলে খেলাফত গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সুলতান ক্ষমতালোভী, জনপ্রিয়তালোভী নেতা ছিলেন না। এ কারণেই আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আরববিশ্বের বেশিরভাগ অংশের নেতৃত্বের অধিকারী একজন সুলতান মাত্র এক দিনার এবং ৪০ দিরহাম রেখে আখেরাতের সফর শুরু করেছিলেন, যা তার মনস্তাত্ত্বিক এ দিকটিরই ইঙ্গিত করে যে, আমি সালাহুদ্দিন কেউ নই। আমি স্বাভাবিক মৃত্যুই চাই। আমার নাম উচ্চারিত না হোক। যদি আমি আল্লাহর জন্য বিজয় অর্জন করতে পারি এবং বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি সেটাই হবে আমার চূড়ান্ত সফলতা।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তার ন্যায়পরায়ণতার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা যাক। যখন তার এক পুত্র আরববিশ্বের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গভর্নর ছিল তখন একবার তিনি শুনতে পেলেন যে, তার পুত্র দরবার থেকে সকল আলেম সরিয়ে দিয়ে কালো জাদু শেখানো এক লোককে উপদেষ্টা বানিয়েছে। এ খবর সুলতান সালাহুদ্দিনের কানে আসে। সাথে সাথে তিনি পুত্রের প্রতি আদেশ জারি করেন, যেন সে এই

---

১৬. *তারিখুনাল মুফতারা আলাইহি*, ডক্টর ইউসুফ কারজাবি।

অবস্থার পরিবর্তন করে আলেমদের পুনর্বহাল করে। কারণ তিনি নিজেও আলেমদের পরামর্শ ছাড়া কখনো কোনো কাজ করতেন না। প্রতিটি ক্ষুদ্র জিনিস, প্রতিটি দিরহাম ব্যয় করতে তিনি কোনো আলেমকে জিজ্ঞাসা করে নিতেন, এটা কি ঠিক আছে? এটা কি হারাম? এটা কি হালাল? যদিও তিনি নিজেও আলেম ছিলেন।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. শুধু একজন যোদ্ধা নন। যদি আমরা তাকে কোনো শ্রেণিভুক্ত করি তবে তিনি একজন আলেম, একজন ইমাম এবং একজন দায়ি ছিলেন। তিনি যোদ্ধাও ছিলেন, শাসকও ছিলেন। সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির মতোই ছিলেন। একটি বিষয় গ্রহণ করে অন্য বিষয় ছেড়ে দিতেন না। তো তিনি সংবাদ পেয়ে ছেলের কাছে চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে লিখলেন, ওই আলেমদের ফিরিয়ে আনো এবং সেই লোকটির মস্তক ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও, যে কালো জাদু শেখায়, নয়তো আমি নিজেই তোমার কাছে আসব এবং তোমাদের উভয়ের ঘাড় কেটে ফেলব! এই ছিল তার আদেশ পুত্রের প্রতি।

তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে যে অপরাধের জন্য পাকড়াও করতেন তাকে সেই সাজা দিতেন। হত্যার বদলে হত্যা। চুরির শাস্তিও যা তা-ই দিতেন। কোনো অন্যায় করতেন না। আল্লাহর কসম! তিনি এমনই ন্যায়বিচারক শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক শাসক ও বীর, যার পক্ষে তার সমর্থকরা ছাড়াও বিরোধীরা পর্যন্ত সাক্ষ্য দিয়েছে! তার পক্ষে পাশ্চাত্যের ক্রুসেডাররা পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দিয়েছে! যারা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং তিনিও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কিন্তু মুসলমানদের মতো তারাও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর সমর্থনে কথা বলেছে।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। শরয়িভাবে কারও অপরাধ প্রমাণিত হলে তার দণ্ডবিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে উঁচু-নিচু পার্থক্য করতেন না, ঘনিষ্ঠ বা অঘনিষ্ঠ বিচার করতেন না। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একবার তার সহচরদের কেউ এমন এক লোকের ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছিল, যে লেনদেনে প্রতারণা করার দায়ে অভিযুক্ত ছিল। সে সুলতানের কাছে সহায়তা চাইল, যেন উক্ত লোকের দণ্ড কিছুটা লঘু করে দেওয়া হয়। কিন্তু সুলতান তাকে ওই কথাটিই বললেন যে কথা একজন মুমিন শাসক বলে থাকেন। তিনি বললেন, এখানে আপনার জন্য

আমার কীই-বা করার আছে, যেখানে মুসলমানদের মধ্যে বিচারক আছেন, যিনি তাদের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকেন। আর শরিয়তের বিধান জনসাধারণ ও বিশেষ সকলের জন্য সমান। শরিয়তের আদেশ-নিষেধ সকলের জন্য মান্য করা জরুরি। আমি নিজেও তো শরিয়তের কাছে দায়বদ্ধ ও শরিয়তের দাস। সুতরাং সত্য আপনার পক্ষেও আসতে পারে বা বিপক্ষেও আসতে পারে।[১৭]

অর্থাৎ, সুলতানের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, একজন শরিয়তের কাছে দায়বদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে শরিয়ত বাস্তবায়ন করা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতা সুলতানের নেই। তিনি নিজেই পুলিশপ্রধান। আর মুসলমানদের বিচারকেরা বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীন। কারণ তারা সকল মানুষের মাঝে শরিয়ত অনুযায়ী সমানভাবে ন্যায়পরায়ণ রায় দিয়ে থাকেন।

শরিয়তের প্রতি একনিষ্ঠ ও দৃঢ়তার কারণে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর নাম ইতিহাসের পাতায় অমর হিসেবে সংরক্ষিত। ইতিহাস তাকে মহান ব্যক্তি হিসেবে স্মরণ করে। তার মানমর্যাদার স্বীকৃতি বন্ধু এবং শত্রু সকলেই দেয়।

বাইতুল মাকদিস বিজয়ের স্বপ্নের হাতছানি

তার চাচা ও সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির মৃত্যুর পর মিশর, সিরিয়া এবং আরববিশ্বের একটি বড় অংশ তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তিনি কী করেছিলেন এত বড় রাজত্ব পেয়ে ভাবুন তো একবার! তিনি কি মেয়েদের নিয়ে এসে নেচে-গেয়ে সাম্রাজ্য লাভের অনুষ্ঠান উদযাপন করেছেন? অন্য নেতারা যা করত তা করেছেন? তিনি চাইলে তা করতে পারতেন। কিন্তু উম্মাহর এই মহানায়ক নিজের জন্য করেননি কিছুই। যা করেছেন আল্লাহর জন্যই করেছেন। তিনি ঠিক আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর মতোই ভাবতেন। সেভাবেই কাজ করতেন। আবু উবাইদা রা. যেমন একের পর এক এলাকা বিজয় করেছেন। আক্কা, হাইফা বিজয় করে দামেশক থেকে ফিলিস্তিনের দিকে গিয়েছেন। যেভাবেই হোক বাইতুল মাকদিস বিজয় করতেই হবে—এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-ও দোয়া করতেন, যে বক্তৃতার

---

১৭. *আল-ওয়াহয়ুল মুহাম্মাদি*, রশিদ রেজা (২৭৬ পৃ., অষ্টম সংস্করণ)।

চিঠি সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি আমার কাছে রেখে গেছেন, তা যেন মসজিদুল আকসায় আমি বলতে পারি। এটাই ছিল তার লক্ষ্য।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। রোমানরা দেখল বিপদ তাদের মাথার ওপর। তারা সবাইকে তার বিরুদ্ধে পুনরায় একত্র করল। ফরাসি, ব্রিটিশদের ১০ হাজার রাজা-নেতা সুলতানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। উভয় দলের মাঝে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাস এই যুদ্ধকে 'মারাকাতুল হিত্তিন' বা হিত্তিনের যুদ্ধ নাম দিয়েছে। এটাই ছিল তার নেতৃত্বে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। সবাই তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এদিকে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি একা এবং তার সাথে তার জানবাজ যোদ্ধারা, যারা আকসা বিজয়ের স্বপ্ন বুকে নিয়ে এসেছে, যাদের চোখে আকসার দ্যুতি। এরা ছিলেন তেমন মুজাহিদ, যাদের ব্যাপারে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির শিক্ষক সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. বলতেন, আমাকে ১ হাজার নওজোয়ান দাও, আমি পৃথিবীর যেকোনো সেনাবাহিনীকে পরাজিত করব!

মুসলিম বাহিনীতে সংখ্যাভিত্তিক শক্তিমত্তা ছিল না। সুলতান সালাহুদ্দিন যখন যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। দোয়ায় মগ্ন রইতেন। এই ছিল তার শক্তি। একবার তার বাহিনী যুদ্ধ শুরুর আগে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় ছিল, যাতে আলো ফুটলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তো সুলতান তাদেরকে ঘুমন্ত দেখতে পেয়ে তাদের সবাইকে এই বলে জাগিয়ে তুললেন, ওঠো, নামাজ পড়ো এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করো। আল্লাহর কসম! আমাদের পরাজয় তোমাদের কারণেই হতে পারে!

সুলতানের এ কথা বলার কারণ কী? তার বাহিনী মদ্যপানও করে না, জুয়াও খেলে না। হাসিঠাট্টায়ও সময় কাটায় না। তারপরেও সুলতান এ কথা বলার কারণ ছিল, তারা কিয়াম ও দোয়া করার পরিবর্তে ঘুমিয়ে রাত কাটাচ্ছিল। তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিল না। বস্তুত এমনই ছিলেন মহান সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তার বাহিনীসমেত হিত্তিনে পৌঁছে যান। সেখানে একটি বিশাল বাহিনী তার জন্য অপেক্ষা করছিল। খ্রিষ্টান রাজা ও নেতারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা এই যুদ্ধে

সুলতানকে বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনুল আসির লেখেন, সমগ্র ময়দানজুড়ে ক্রুসেডারদের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। বন্দীর চেয়ে বহুগুণে মৃতদেহ পড়ে ছিল। প্রায় পুরো সেনাবাহিনীই মারা পড়েছিল। উট এবং ঘোড়ার হাঁটু রক্তে ডুবে ছিল। লাশের পর লাশ দেখা যাচ্ছিল।

এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়। উম্মাহর এই মহানায়ক তার চোখের সামনেই আল্লাহর বাণীর প্রমাণ পেলেন,

إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচল রাখবেন।[১৮]

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ.

সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।[১৯]

আল্লাহর দেওয়া এই দুটি ওয়াদা বুকে চেপে সুলতান সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আর আল্লাহও তাকে বিজয় দান করলেন। তিনি বলেননি যে, বিজয় শান্তি আলোচনা করলে আসে। তিনি চাইলে সেটা করতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি। শান্তি আলোচনা মানুষকে ভীরু-কাপুরুষ বানায়, নীচ-হীন করে তোলে। অথচ আমরা তা-ই বলি এবং বলতেই থাকি। অথচ সুলতান কিন্তু এ কথা বলেননি যে, চলো, সমস্ত ফরাসি সৈনিক নিয়ে জাতিসংঘের কাছে যাই। বরং তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর শক্তিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর পতাকা উড্ডীন করব। এই বলেই তিনি এগিয়ে গেলেন। ইবনুল আসির আরও বলেছেন, সমগ্র ময়দানজুড়ে ক্রুসেডারদের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। আরও অনেক সৈন্য বন্দীও হয়। তাদের নেতা, রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ সৈনিকও বন্দী হয়।

যুদ্ধ শেষে সুলতানের পাশে উপবিষ্ট পুত্র বলে উঠলেন, আমরা বিজয়ী হলাম! কথা শুনে তার পিতা তাকে বললেন, তোমার মুখ বন্ধ করো বোকা। যতক্ষণ

---

১৮. সুরা মুহাম্মাদ : ৭।
১৯. সুরা আলে-ইমরান : ১২৬।

না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর পতাকা এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রুসেডারদের পতাকা ধুলোয় আছড়ে পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিজয়ী হতে পারি না!

তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি কখনো হাসেননি। তার গুরু সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর আলোচনায় আমরা জেনেছিলাম একটি হাদিসের কথা। যে হাদিসের শেষে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসেছেন। তাই হাদিসটি বর্ণনার সময় মুহাদ্দিসগণ হাসেন। কিন্তু সে হাদিসটি শুনেও সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. হাসেননি। তার সৈন্যরা তাকে বলেছিল, আপনি সবসময় সুন্নাহ অনুসরণ করেন। তো আপনি এখন কেন হাসলেন না? এই হাদিসের শেষে নবী আ. হেসেছেন বলেই সবাই হাসেন।

তখন সুলতান বলেছিলেন, উম্মাহর একটি অংশ যখন ক্রুসেডারবেষ্টিত থাকে, তখন আমি কীভাবে হাসতে পারি?! আমি কীভাবে হাসতে পারি, যখন মুসলিম উম্মাহর ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চলছে?! যখন মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে, তখন আমি কীভাবে হাসব?!

সুলতান নুরুদ্দিনের শিষ্য সুলতান সালাহুদ্দিনও একই কথা বলেছেন। হিত্তিনের বিজয়ের পরও তিনি হাসেননি। সকলেই জিজ্ঞেস করছিল, আপনি হাসছেন না কেন?

তিনি বললেন, বাইতুল মাকদিস যখন মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তখন আমি কীভাবে হাসব?! কীভাবে আমি আনন্দ উদযাপন করতে পারি?!

প্রিয় পাঠক, যখন ফিলিস্তিন, স্পেন এবং সমগ্র মুসলিমবিশ্ব মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণহারা, তখন আমরা কীভাবে হাসি?! আর যা বাস্তবে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে বলে দেখতে পাই তা সত্যিকার অর্থে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তা মূলত মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে নয়। তা পূর্ব ও পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এমন একটা দিন যায় না, যেদিনটায় মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ হয় না। যতদিন এমন দিন দূর না হবে, আমরা হাসবে কী করে?! পত্রিকা খুললেই এমন একটা দিন খুঁজে পাওয়া যায় না, যেদিন মুসলমানদের হত্যা করা হয় না। আল্লাহর কসম! এ কথা সত্য। বছরের পর বছর এমনই চলছে। একদিনও সুখের নয়। ফিলিস্তিনের একটি দিনও গণহত্যাবিহীন যায় না। অথচ ফিলিস্তিন সেই একই ভূমি, যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা সবেগে তাদের রক্ত ঝরিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা আবার

কবে আমাদের সুদিন ফিরে পাব?!

হিত্তিনের মহান বিজয়ের পর তিনি ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হন এবং বাইতুল মাকদিস অবরোধ করেন। শহরের ভেতর থেকে একজন নেতা তাকে একটি চিঠি পাঠান। তাতে লেখা ছিল, যদি আপনি আমাদের যেতে দেন তবে আমরা শহর ছেড়ে দিতে রাজি।

জবাবে তিনি তাদের আরেকটি চিঠি পাঠান। সেখানে লেখেন, মহান আল্লাহর কসম! হয় সোজাসাপটা পরাজয় মেনে নিয়ে শহর আমাদের হাতে তুলে দেবে অথবা আমি জোর করে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরাও এমনই বলেছিলেন। যদিও এই ঘটনা ঘটার সময় সালাহুদ্দিন আইয়ুবির জন্মও হয়নি। সুলতানের হাতে আকসা বিজয়ের আগে বাইতুল মাকদিস ৯১ বছর ক্রুসেডারদের দখলে ছিল। সালাহুদ্দিন তখন জন্মগ্রহণও করেননি, যখন ক্রুসেডাররা বাইতুল মাকদিস কবজায় নিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের বলেছিলেন, তোমরা আমার পূর্বপুরুষদের হত্যা করেছ। আল্লাহর কসম! আমরা বাইতুল মাকদিস দখল করেই ছাড়ব।

কারণ ইসলামে প্রতিশোধ আছে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.

আর তোমরা যদি (কোনো জুলুমের) প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ততখানি নেবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তবে সবরকারীদের জন্য সেটাই উত্তম।[২০]

৯১ বছর আগে ফিলিস্তিন মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল একজন ফরাসি মানুষ। তার নাম ছিল শেরাক। এই ফরাসি লোকটাকে তার মা জেরুজালেম বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চার করে

---

২০. সুরা নাহল : ১২৬।

বড় করেছে। মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিদ্বেষ তার মনে জেরুজালেম বিজয় তথা মসজিদুল আকসা দখলের বীজ বপন করেছে। তার মা তাকে শৈশব থেকেই এভাবে লালনপালন করে বড় করেছে। বস্তুত আমাদেরও এমন মা-বোন দরকার, যারা তাদের সন্তানসন্ততি, স্বামী ও ভাইয়ের মধ্যে আমাদের প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসা দখলদারদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যম জাগিয়ে তুলবে এবং আমাদের সন্তানদেরকে স্বপ্ন দেখাবে। ইহুদিদের প্রতি চূড়ান্ত বিদ্বেষ আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের বিদ্বেষ শেখাতে হবে। ভালোবাসা এবং ঘৃণা শেখাতে হবে। ছোটবেলা থেকেই ফরাসি লোকটাকে যা শেখানো হয়েছিল, তা ছিল ইসলামবিদ্বেষ। মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। যখন সে বড় হয়ে যৌবনে উপনীত হলো, তখন সে একটি বড় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়, যা বাইতুল মাকদিস আক্রমণ করেছিল। ইবনুল আসির লিখেছেন, শেরাকের জেরুজালেমে প্রবেশের প্রথম সপ্তাহে যা ঘটেছিল তার চেয়ে খারাপ ইতিহাসে আর কিছুই ঘটেনি।

প্রথম সপ্তাহে সে ৭০ হাজারজনকে হত্যা করেছিল। তারা সবাই ছিল মুসলমান। এই ঘৃণিত মানবসন্তানকে একজন মহিলাই বড় করেছে। একজন মহিলাই তাকে মতাদর্শ শিখিয়েছে, তার মধ্যে ইসলামবিদ্বেষের বীজ রোপণ করেছে। আমাদেরও এটিই করতে হবে। বিপরীতপক্ষে যারা খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের সাথে আন্তঃবিশ্বাস ও প্রেম-ভালোবাসার চর্চা করে, তারাই আমাদের আকিদা নষ্ট করেছে। তাই ঘৃণার শিক্ষা কঠোর এবং বিপজ্জনক হিসেবে দেখা হয়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.

> ঈমানের অন্যতম শক্ত হাতল হলো, তুমি আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করবে।[২১]

প্রিয় পাঠক, আমরা যদি ঈমানের সত্যিকারের স্বাদ পেতে চাই তবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণার আকিদা ধারণ করতে হবে। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা না থাকলে আমরা নিজেদেরকে মুমিন বা মুমিনের কাছাকাছি বলারও কোনো উপায় নেই। ইন্টারফেইথ চর্চাকারী বোকা যে আন্তঃধর্মীয় প্রেমের কথা বলছে, তা তো এমনকি খ্রিষ্টানদের মধ্যেও নেই!

---

২১. মুসনাদে আহমাদ ৪/২৮৬।

এতই যদি ভালোবাসার চর্চা হয় তাহলে সাদ্দামকে ভালোবাসতে পারে না কেন তারা?! বুশ কেন সাদ্দামকে ভালোবাসতে পারে না?! কেন তারা সবসময় তাকে নিয়ে নেতিবাচক বক্তৃতা করে?! তাদের কাছে যেটার নাম ভালোবাসা তা হলো, 'আমার ডান গালে চড় মারতে চাও? এসো আমি আমার ডান গাল পেতে দেবো' টাইপ। এই হলো তাদের ভালোবাসার নমুনা।

কিন্তু আমাদের ভালোবাসা হতে হবে মুমিনদের জন্য ভালোবাসা। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। যদি তাদেরকে বলা হয়, ভালোবাসতে হলে সাদ্দামকে ভালোবাসুন, ওসামা বিন লাদেনকে ভালোবাসুন। কিন্তু তারা সেটা পারবে না। তারা তা করতে পারে না। কারণ যে ভালোবাসার সংজ্ঞা তারা দিচ্ছে, তা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে না। তাদের এই দ্বিমুখী বাস্তবতা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না, বরং এটা তখনই বাস্তবতায় পরিগণিত হয়, যখন তারা আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। অন্য ধর্মের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ দেখলে তারা আমাদেরকে বলে বসে, তোমরা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ?! অথচ আমরা যতটা বিদ্বেষ পোষণ করি, তার চেয়ে বেশি ঘৃণা ও বিদ্বেষ আমরা তাদের পক্ষ থেকে পেয়েছি। কিন্তু সমস্যা হলো তারা চায় না যে, এই উম্মাহর মধ্যে যারা গণহত্যা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা থাকুক। তারা চায় না যে এই উম্মাহ তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করুক, যারা আমার-আপনার বোনকে হত্যা ও ধর্ষণ করে, যারা প্রতিদিন তাদেরকে চেকপয়েন্টে এবং ফিলিস্তিনে উলঙ্গ করে। তারা চায় না যে, আমরা এর বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করি। কারণ তাদের প্রতি ঘৃণা রাখা বিপজ্জনক। কারণ এই ধরনের ঘৃণার জন্য শেরাকের মতো একজন লোকের সাথে শেরাকের তুলনাও তারা করতে চায় না। দেখুন, তাদের ওয়ালা ও বারা কতটা বিপজ্জনক! আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

হে ঈমানদাররা, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো

না। তারা পরস্পরেই একে অপরের মিত্র।[২২]

খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের কেউ কখনো আমাদের আনুগত্য গ্রহণ করবে না। তারা কেবল একে অপরের প্রতি অনুগত। বরং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে আমাদেরকে। আমাদেরকে তাদের বিপরীত দিকে থাকতে হবে। কিন্তু তাদের বিপরীতে আমাদের অবস্থান গ্রহণ তাদের জন্য বিপজ্জনক। সে কারণেই শেরাক ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালিয়েছে, ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে মুসলমানদেরকে। এমনকি সেসব খ্রিষ্টানকেও কারারুদ্ধ করেছে, যারা মুসলমানদের সমর্থন করেছিল বা তাদের সাথে বসবাস করেছিল। কারণ মুসলমানদের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল। অতঃপর সে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন মাথা জড়ো করে একটি পাহাড়ের চূড়ায় রেখে তা দেখতে লাগল। মুসলমানদেরকে হত্যা করে তাদের মস্তক জড়ো করে হাসতে হাসতে সে বলল, আমাকে একজন লেখক এনে দাও, যে আমার পক্ষ থেকে আমার মায়ের কাছে একটি চিঠি লিখবে। তারপর ওই চিঠিতে সে তার মাকে জানায়, আমার প্রিয় মা, আমাকে যা বলেছিলেন সব মনে আছে? আজ আমার চোখের সামনে তা সত্য হয়ে গেছে। আমি ইসলামকে ধ্বংস করেছি। এবং আমি নবী মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসারীদের ধ্বংস করেছি।

হ্যাঁ, একজন মহিলাই এই গণহত্যাকারীকে বড় করেছে। একজন মহিলার প্রতিপালনে বড় হওয়া একজন পুরুষ কী সাধন করে ফেলল, দেখেছেন?! ভয়ংকর একজন খুনি, যে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে, যা ৭০ হাজার মুসলমানের মাথার পাহাড়! বস্তুত ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

১৯৪৮ সালে যখন তারা ফিলিস্তিন দখল করল তখন আন্তঃধর্মীয় ভালোবাসার কথা বলা লোকেরা বলেছিল, ১ হাজার বছর আগে যা করা হয়েছে, বর্তমান খ্রিষ্টান এবং ইহুদিরা তা করেনি। কিন্তু আমি বলছি, তারা তা করবে। মুসলমান ছাড়া কেউ এই বিশ্বকে ন্যায়ের সাথে শাসন করতে পারে না। ১৯৪৮ সালে যখন মোশে দায়ান ফিলিস্তিন দখল করে, তখন সে শহরে ঢুকে এক গর্ভবতী নারীর পেট কেটে ফেলে। ইহুদি এবং খ্রিষ্টানেরা যে দেশ বা যে শহরই দখল করেছে তারা সেখানে গণহত্যা চালিয়েছে এবং বর্বর হত্যাকাণ্ড উদযাপন করেছে। ইতিহাস এর সাক্ষী। তারা অনেক শহর দখল করেছে।

---

২২. সুরা মায়েদা : ৫১।

মোশে দায়ান দারে ইয়াসিনের[২৩] ভেতরে প্রবেশ করে উক্ত গর্ভবতী নারীর পেট কেটে শিশুটিকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে। সে নারীদের ধর্ষণ করে, তাদের উলঙ্গ করে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সকলের সামনে মুসলিম নারীকে অপমান করার পেছনে তারা জানত যে, মুসলমানদের মধ্যে নারীরা অনেক সম্মানিত। তাই তাদেরকে উলঙ্গ করে অসম্মান করে তাদের সামনেই মদ খেয়ে নেচে নেচে গান করতে লাগল। তারা কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল—

মুহাম্মাদের ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে,
মুহাম্মাদ গেছে মরে—
সে গেছে চলে।

মুসলিম নারীদেরকে খ্রিষ্টান হায়েনার মুখে ফেলে শাসকরা চলে গেছে ইহুদিদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে। ইয়াসির আরাফাত একই কাজ করেছে। তারা শান্তি আলোচনায় বসতে ইচ্ছুক, কিন্তু সঠিক সমাধান পেতে রাজি নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করতে রাজি নয়। তারা আমাদের নারীদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করেছে। তাদেরকে উলঙ্গ করে রেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা করেছে। কোনো গাধা এবং শূকর আমাদের নারী সম্পর্কে কথা বললে আমরা কি তা হতে দেবো? এসব ঠেকাতে হলে আমাদেরকে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। মহান আল্লাহর কসম! এই কবিতার আবৃত্তিকারকরা যে বাতাসে শ্বাস নিয়েছে, সে বাতাসের মূল্য তাদের চেয়ে অনেক বেশি। তারা যে ময়লাতে পা দেয়, তার মূল্য তাদের চেয়ে বেশি। আমাদের নবী এবং আমাদের নারীদের নিয়ে অপমান আমরা সইতে পারি না। তাই আমাদের পূর্বসূরিরা বিগত ইতিহাসে যেভাবে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিলেন, তাদের হাত থেকে মসজিদুল আকসা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, সেভাবেই আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. বাইতুল মাকদিসের পানে অগ্রসর হন। তিনি ভেতরে আগেই পত্র পাঠিয়েছিলেন। যার বার্তা ছিল, সহজভাবে শহর ছেড়ে না দিলে জোর করে প্রবেশ করা হবে। কিন্তু ভেতর থেকে পালটা চিঠিতে বলা হয়, আপনি জোর করে প্রবেশ করলে আশেপাশের সব মুসলমানকে হত্যা করা হবে।

---

২৩. ফিলিস্তিনের একটি গ্রামের নাম।

আর একজন মুসলমান ভালোভাবেই জানত আরেকজন মুসলমানের রক্তের মূল্য। তাই সুলতান হাল ছেড়ে দিলেন; ফিলিস্তিন ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে নয়, বরং তাদের ওপর জোর করে প্রবেশ না করে শান্তিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার জন্য হাল ছাড়লেন। ইতিহাসে এই অংশটি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের হত্যা করেননি। বরং তিনি মক্কা বিজয়ের অনুপম আদর্শ ধারণ করেন। তিনি যখন ভেতরে প্রবেশ করেন, তার মস্তক মহান রবের শোকরগুজারিতে অবনত ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তিনিও ঠিক সেভাবে মাথা নিচু করে প্রবেশ করলেন। বিনীত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। খুশিতে কেঁদে ফেললেন। এটি একটি বড় বিজয় ছিল। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আমলে এই শহর মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। এটা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও ইচ্ছা ছিল। মহান আল্লাহর কসম! মুআজ ইবনে জাবাল রা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস আছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে বলেছিলেন, ফিলিস্তিন বিজিত হবে। তো সাহাবায়ে কেরাম রা. ফিলিস্তিন, বাইতুল মাকদিস, আকসাকে ভালোবাসতেন। ভালোবেসে দীর্ঘসময় তারা অপেক্ষায় ছিলেন, কবে এই শহর বিজিত হবে। কবে তারা দেখতে পাবেন আকসা। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বলেছিলেন, এই শহর বিজয় করবে তোমরা। উমর রা. সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য করেন। আর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ক্রুসেডাররা দখল করার পর এই শহর তাদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন। এখন আমরা আপনাদের মধ্য থেকেই কারও হাতে তা পুনরায় জয় করার জন্য অপেক্ষা করছি। এটাই আমাদের লক্ষ্য। ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা আমাদের লক্ষ্য না হলে আমাদের আত্মপরিচয় প্রশ্নবিদ্ধ। ইয়াসির আরাফাতের হাতে ইহুদিদের তুলে দেওয়া দুটি শহর নয় কেবল, বরং সমগ্র ফিলিস্তিন, সমগ্র মুসলিমবিশ্ব, সমস্ত কিছু মুসলমানদের হাতে পুনরায় ফিরতে হবে। সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির মতো এবং সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মতোই আমাদের লক্ষ্য হতে হবে।

সুলতান সালাহুদ্দিন আকসা বিজয়ের পর ভেতরে প্রবেশ করে কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, যা একজন মহিলা তাকে লিখে দিয়েছিলেন। এই কবিতাটিই সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে ফিলিস্তিন অভিযানে অনুপ্রাণিত করেছিল। কবিতাটি ছিল এই—

হে ক্রুসেডারদের ক্রুশ ধ্বংসকারী ব্যক্তি,
যিনি শহরের পর শহর বিজয় করে চলেছেন—
শুনুন হে, এই চিঠি এসেছে আপনার কাছে,
বাইতুল মাকদিস থেকে ফিলিস্তিনের তরে।
সকল মসজিদই স্বস্থানে পবিত্র অন্যের মাধ্যমে,

আমিই একমাত্র সম্মানিত মসজিদ, যে পবিত্র হয়েছে কাফেরদের হাত থেকে।

সুলতান যখন এই চিঠি ও কবিতা পড়েন, তখন ফিলিস্তিনকে মুক্ত করাই তার লক্ষ্য ছিল। তিনি আকসায় প্রবেশ করার প্রাক্কালে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই কবিতাটি উচ্চারণ করতে করতে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করলেন। ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে সুলতান দ্বিতীয় যে কাজটি করলেন তা হলো, ৪৫ বছর আগে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর নির্মাণ করা মিম্বার আনার আদেশ দিলেন। এই মিম্বার পুরো যুদ্ধের সময় ধরে সুলতানের বাহিনীর সাথে ছিল। ৪৫ বছর ধরে মিম্বার সংরক্ষণ করা হয়েছে। কেউ বলেনি, মিম্বারের কথা ভুলে যাও। যে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই মিম্বার নির্মাণ করা হয়েছিল, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এমন একটি উচ্চ লক্ষ্য, যা আমরা করতে পারি না। ফিলিস্তিন আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৬৫ বছর হয়েছে প্রায়। সেই সময়ের কথা কল্পনা করুন, যে সময় এই মিম্বারটি নির্মাণ করা হয়েছিল, অথচ তারও প্রায় ৫০ বছর আগে থেকেই বাইতুল মাকদিস কাফেরদের দখলে ছিল। কিন্তু কেউ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুলে যায়নি, আকসা বিজয়ের স্বপ্ন থেকে পিছু হটেনি। একটি মিম্বার নির্মাণ করে ৪৫ বছর ধরে সকলেই সেটাকে আগলে রেখেছে, সযত্নে রেখেছে। সংরক্ষণ করেছে, যেন তাদের লক্ষ্য অর্জনের পর উদযাপন করা যায়। দীর্ঘ ৯১ বছর বাইতুল মাকদিস ক্রুসেডারদের হাতে ছিল। তাই আমাদের আশা সবসময় ধরে রাখতে হবে। কখনো বলবেন না, হে আল্লাহ, ফিলিস্তিন কি আমাদের হাতে আসবে না?! আমাদের আশা, ইনশাআল্লাহ আমরা এখানে যেভাবে মিলিত হয়েছি, ইনশাআল্লাহ আমরা ফিলিস্তিনেও সেই অত্যাচারীদের সামনেই মিলিত হব, যারা আমাদের ভাই ও বোনদের হত্যা ও ধ্বংস করেছে। এটাই আমাদের আশা এবং লক্ষ্য। যদি এটিই আমার-আপনার আশা এবং লক্ষ্য না হয়, তবে আল্লাহর প্রতি আপনার ঈমানের পরীক্ষা করুন।

মহানায়কের প্রস্থান

সুলতান সালাহুদ্দিন ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা করেন বিজয়ের অল্প সময়ের মধ্যেই। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে ফিলিস্তিনের পতন ঘটে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ৫৮৩ বছর পরে। এর পাঁচ বছর পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুলতান এমন এক বীর ছিলেন, যে বীর যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাবে কল্পনা করা যায় না। এমন একজন বীরের সারা শরীরে ক্ষত থাকবে, তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্নভিন্ন করা হবে, এমনটা অসম্ভব। তিনি সেভাবেই ইনতেকাল করেন, ঠিক যেভাবে তার শিক্ষক দুনিয়া ছেড়ে গেছেন। ঠিক যেমন তাদের সকল আদর্শ দুনিয়া ছেড়ে গেছেন। যেমন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, উমর ইবনে খাত্তাব রা.। তাদের লক্ষ্য ছিল শাহাদাত লাভ। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করা। আমার-আপনার লক্ষ্য শাহাদাত কি না আমাদের ভাবতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা কি জীবন দিতে পছন্দ করি? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقتَلَ فِي سَبِيل الله ثمَّ أُحْيِي ثمَّ أُقتَلُ ثمَّ أُحْيِي ثمَّ أُقتَلُ ثمَّ أُحْيِي ثمَّ أقتل.

সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, যদি কিছু সংখ্যক মুমিন আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পারার ফলে তাদের মন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত, আবার আমিও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বাহন সরবরাহ করতে পারছি না, (যদি এরূপ সংকট না দেখা দিত,) তবে আমি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া কোনো সেনাবাহিনী হতেই পেছনে থাকতাম না। যার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হলো, আমি আল্লাহর পথে শহিদ হই, অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হোক আর তারপর আমি আবার যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যাই,

তারপর পুনরায় আমাকে জীবিত করা হোক এবং আবার যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হই, আবার জীবিত করা হোক এবং আবার শহিদ হই।[২৪]

জি, এটাই ছিল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলতেন, হে আল্লাহ, আমাকে মদিনায় মৃত্যু দিন এবং আমি মদিনায় শহিদ হব। এ শুনে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি কী বলছেন?! মদিনা আমাদের দখলে থাকা অবস্থায় আপনি কীভাবে মদিনায় শহিদ হবেন?! কিন্তু উমর ছিলেন শাহাদাতপিয়াসি। পাঠক, আপনিও যদি দোয়া করেন, আল্লাহ আপনাকে শহিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন, এবং যদি আপনি চেষ্টা করেন ও মনে মনে শাহাদাতের কামনা লালন করেন, কিন্তু এরপরে যদি আপনার স্লিপিং ব্যাগে, আপনার সোফায় কিংবা আপনার বিছানায়ও মারা যান, তবুও আপনি শহিদের প্রতিদান পাবেন। এটা হাদিস। তবে তার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর নেক বান্দা ও শাহাদাতপিয়াসি হতে হবে। আমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসি তবে আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. একইভাবে উমরের মতো শহিদ হতে চেয়েছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. মদিনায় শহিদ হন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর ইচ্ছা ছিল যুদ্ধের ময়দানে শহিদ হওয়া। কিন্তু তিনি এত বড় বীর ছিলেন যে, কোনো কাফেরের পক্ষে তাকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। তিনি শতাধিক যুদ্ধ করেছেন এবং প্রতিটি যুদ্ধে তিনি শহিদ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু কোনো যুদ্ধেই তিনি শহিদ হতে পারেননি। মৃত্যুকালে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমার শরীরে বর্শার ক্ষত, তরবারির ক্ষত ব্যতীত কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও নেই। সারা শরীরজুড়ে শত আঘাতের চিহ্ন নিয়ে আমি একজন সাধারণ মানুষের মতো মারা যাচ্ছি। তাই বলছি, কাপুরুষরা যেন ভয়ে ঘুমিয়ে না থাকে। সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-ও মৃত্যুর সময় কেঁদেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, আল্লাহ অবশ্যই আমাকে ঘৃণা করেন। কারণ তিনি আমাকে শহিদ হিসেবে কবুল করেননি। এত মানুষ আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমাকে আক্রমণ করেছে, তবুও আল্লাহ আমাকে শহিদ হিসেবে কবুল করেননি।

এই বলে বলে পাগলের মতো কাঁদছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-ও যুদ্ধের ময়দানে শহিদ হননি। তিনি তার বিছানায় ইন্তেকাল করেছেন।

---

২৪. *সহিহ বুখারি*, (২৭৯৭), *সহিহ মুসলিম*, (১৮৭৬)।

মৃত্যুকালে কাজি অর্থাৎ বিচারপতি বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ এবং অন্য কাজিগণ তার বিছানার পাশে বসে তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছিলেন। কারণ সালাহুদ্দিন আইয়ুবি যেকোনো সময় একা হলেই হয় কুরআন তেলাওয়াত নয়তো সিরাত বা হাদিস অধ্যয়ন করতেন। ইনতেকালের সময় তিনি অসুস্থতার ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তার পাশে কুরআন তেলাওয়াত চলছিল। তেলাওয়াত যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছল,

هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ.

> তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র।[২৫]

এ আয়াত শুনে তিনি হুঁশ ফিরে পান। তিনি উঠে তার মাথা তুলে বললেন, সাদাকতা। অর্থাৎ, আপনি যা বলেছেন তা সত্য, তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

এই আয়াত তেলাওয়াতের পরপরই তিনি রফিকে আলার ডাকে সাড়া দেন। উম্মাহর এই মহানায়ক পরকালের সফর শুরু করেন। সুলতানের মৃত্যুতে পুরো দামেশক শহর কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে অঝোর ধারায় কেঁদেছিল।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি শুধু মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন না, ইহুদিরা পর্যন্ত তাকে শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে নিয়ে ইতিহাসবিদরা লিখেছেন, এ ছাড়া ইহুদিরা ফিলিস্তিনের বাইরের ইহুদিদের কাছে পাঠানো চিঠিতে লিখেছিল, আমরা একজন শ্রেষ্ঠ নেতা পেয়েছি।

---

২৫. সুরা হাশর : ২৩।

চিত্র : ডেমাস্কাসের পুরোনো শহরে, বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদের পাশে 'সালাদিন মাজার', গম্বুজটির নিচেই রয়েছে আইয়ুবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কবর

সুলতান আইয়ুবি তাদেরও সেরা নেতা ছিলেন। উম্মাহর এই মহানায়ক কেন ইহুদিদেরও শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন, তার কারণ যদি আমরা খুঁজতে যাই, তবে আমরা দেখতে পাব, সুলতান তাদের সাথে তাদের মতো আচরণ করেননি, যেমন আচরণ তারা মুসলমানদের সাথে করেছিল। সুলতান ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে ৭০ হাজার মাথা কেটে পাহাড় তৈরি করেননি এবং ফরাসি লৌহমানব শেরাকের মতো তার মায়ের কাছে চিঠি লেখেননি। বরং তিনি তাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করেছিলেন। তিনি সবাইকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ফিলিস্তিনে মুসলমানদের শাসনামল ছাড়া কখনোই কেউ সুখেশান্তিতে বসবাস করেনি।

প্রিয় পাঠক, দেখুন, একজন ইহুদি তার অন্য ইহুদি বন্ধুকে চিঠি পাঠিয়ে বলছে, আমাদের একজন রাজা আছে, যে সবার শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি হলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি।

তারাও তার জন্য কেঁদেছিল। বস্তুত শুধু তারাই কাঁদেনি, যারা তাকে ঘৃণা করে। যুগপৎ যারা তাকে ও আমাদেরকে ঘৃণা করে, শুধু তারাই কাঁদেনি। আর তারাই

হলো অত্যাচারী, আগ্রাসী, কাফের, আল্লাহর শত্রু, মানবতার শত্রু, ন্যায়ের শত্রু।

মুসলিম উম্মাহর পতনে ক্রুসেডারদের উত্থান

ক্রুসেডাররা আবারও ফিরে আসে এবং তারা প্রথম দেখায় সালাহুদ্দিনের কবরে লাথি মারে। এক ক্রুসেডার জেনারেল সুলতানের কবরে লাথি মেরে বলে, ওঠো সালাহুদ্দিন, ওঠো! ওদেরকে বাঁচাও, যেমনটা তুমি প্রথমবার বাঁচিয়েছিলে। এসব বলে তারা হাসতে শুরু করে। হোসনি মোবারক, বাদশাহ ফাহাদ এবং এসব বিশ্বাসঘাতক আরব নেতার কারণে সুলতানের কবরে এমন কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে ওরা।

আজ আমাদের মাঝে সালাহুদ্দিনের মতো কেউ নেই। এইজন্যই তারা কবরে লাথি মারতে পেরেছে। আজ ইহুদিরা সেই কাজই করছে। আমাদের আশা এবং প্রত্যাশা যে, আমাদের মাঝে সালাহুদ্দিনের মতো মহানায়ক আবারও জন্মলাভ করবে। আমরা সেভাবে তাকে গড়ে তুলব। আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে, যেভাবে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি প্রথমে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আমাদের মাঝে এমন অনেক লোক আছে, যারা হাদিস, তাফসির, ফিকহ এসব শিখতে চায় না। তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বার্তা হলো, আমরা যে এ সকল দরস তৈরি করি, এর মূল উদ্দেশ্য হলো সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মতো মানুষ গড়ে তোলা। ওয়াল্লাহি, এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু তাফসিরের দরস শুনে ফিরে গিয়ে ঘুমানো নয়; বরং আমাদের লক্ষ্য হলো, আমরা এই উম্মাহর মাঝে দেখতে চাই সালাহুদ্দিনের মতো ব্যক্তিত্ব। আমরা ধ্বংস করতে চাই সেই আধুনিকতাবাদীদের, যারা আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতাবাদীরা মুসলমানদের দেশ দখল করতে চাইছে, যারা আল্লাহর আদেশকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। এবং তাদের সাথে মিডিয়া আছে, তাদের সাথে তাদের ক্ষমতা আছে, তাদের সাথে তাদের অর্থ আছে, তাদের সাথে জাতিসংঘ রয়েছে। আর আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ নেই, কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সেজন্য আমাদের লক্ষ্য এ সকল লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। নিশ্চয় ইসলামের মোকাবিলায় দাঁড়ালে তারা ইসলামকে হারাতে পারবে না। তবে তারা একটা কাজ করতে পারবে। তারা

ইসলামের মধ্যে আধুনিকতাবাদী ক্যান্সার ছড়াতে পারবে। মুসলমানের সন্তানসন্ততিদেরকে তারা ধ্বংস করে ফেলছে। আল্লাহর কসম! আমি (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল) হার্ভার্ডের ভাই ও বোনদের কাছ থেকে একটি কল এবং একটি ইমেইল পেয়েছি। খ্রিষ্টান-ইহুদি ব্রাদারহুড নামে একটি দল বা এরকম একটা সংগঠন আছে। তারা সেখানে প্রচার করে বেড়ায় যে, সকল আবরাহামিক ধর্ম একই। তারা নাকি কুরআনের চর্চাও করে। ইহুদি এবং মুসলিম ভাই ভাই বলে। তারা আমাকে মেইলে বললেন, আমরা এক সপ্তাহে কুরআন আর এর তাফসির পড়ি। এক সপ্তাহ বাইবেল এবং এর তাফসির এবং পরের সপ্তাহে তাওরাত এবং এর তাফসির পড়ি। কতটা ভয়াবহ ব্যাপার ভেবে দেখুন! বিকৃত বাইবেল ও তাওরাতের সাথে কুরআনুল কারিমকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে!

মহান আল্লাহর কসম! এই দেশে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় একটি উন্নত জায়গা। সেখানকার শিক্ষিত মুসলমানরা পর্যন্ত তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে, তবে অন্যদের কাছ থেকে কী আশা করা যায়! এই লোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বারবার তাগাদা দিয়েছেন, ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে আলাদা হও! ভিন্ন হও! এবং এই বোকারা, যারা হার্ভার্ডে নিজেদের স্মার্ট মনে করে, তারা প্রকারান্তরে যেন নবীকে বলছে, আপনি ভুল করছেন! আপনি ভুল! আমরা হার্ভার্ডের স্নাতক! সময় বদলেছে! আমরা স্মার্ট, আমরা জিনিয়াস!

নবী বলেছেন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে আলাদা হতে, অথচ আমরা মিল খোঁজার চেষ্টা করি। কতটা ভিন্নতা তাদের সাথে আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে, তা আমরা সিরাত থেকেই পাই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর ইবনে খাত্তাব রা.-কে তাওরাতের এক পৃষ্ঠা পড়তে দেখে বলেছেন, উমর, তুমি কী করছ? কী করছ উমর?! উত্তরে উমর বিন খাত্তাব রা. বলেন, আমি মাত্র একটি বা দুই পৃষ্ঠা পড়ছি।

পাঠক, ভাবুন তো! আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আন্তঃধর্মীয় বিশ্বাসে আস্থা রাখতেন? উমরকে কি আন্তঃধর্মীয় মনে হয়? আপনি কি মনে করেন, উমরের ঈমান দুর্বল? বরং উমর রা. ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর দ্বিতীয় সেরা মানুষ। আপনি কি মনে করেন, উমর রা. যা পড়বেন তাতে প্রভাবিত হবেন? কিন্তু এরপরেও আমাদের

নবী তার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, তার মুখের রং পরিবর্তন হয়ে গেল! এবং বলে উঠলেন, উমর, আমরা এর চেয়ে ভালো কিছু পেয়েছি!

এই যে আজকালকার মুসলমানরা বাইবেল এবং তাওরাত পড়ছে, তা কীসের ভিত্তিতে?! তা আন্তঃধর্মের বিশ্বাসের জন্য তো নয়ই। এই আন্তঃধর্মীয় বিশ্বাস মূলত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একটি ধ্বংসাত্মক ক্যান্সার। তাদের উদ্দেশ্য হলো, কুরআন, বাইবেল এবং তাওরাত একসাথে করে ফেলা। মসজিদ, গির্জা এবং সিনাগগ একসাথে রাখা। আল্লাহর কসম! এটাই তাদের লক্ষ্য। এই কাজ করে তাদের উদ্দেশ্য কী, তা জানতে হবে আমাদের। কারণ তারা ইসলামের মুখোমুখি মোকাবিলায় অবতীর্ণ হতে পারে না। ইসলাম দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম। মহান আল্লাহর কসম! খুব শীঘ্রই সঠিক আকিদা ও ইসলামের মাধ্যমে মুসলমানরা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছে। ন্যায়পরায়ণ অমুসলিমরাও এটাই চায়। মুসলমানরা নিজেরাও বিশ্বাস করে, এটাই তাদের লক্ষ্য। তবে আমরা কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করি না। তবে আমরা এই ঈমান রাখি, ইসলামের উচিত বিশ্বকে পরিচালনা করা। এই বিশ্বাস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। হাদিস এবং ইতিহাস যা বলেছে তা আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

তো সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ইলম, ফিকহ, সিরাত, তাওহিদ, আকিদা দিয়ে শুরু করেন। আকিদা দিয়ে শুরু করার কারণ ছিল, যেন তিনি ফাতেমিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। তারা হজরত আয়েশা রা.-কে অভিশাপ দিত। বর্তমানে শিয়ারাও এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে। অথচ আমরা তাদের সাথে নিয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। এটা কোন ধরনের ইসলাম?! যে আপনার মাকে অভিশাপ দিচ্ছে, তাকে আগে আপনার নির্মূল করতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের মাকে অভিশাপ দেওয়া কোনো ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে তৃতীয় পক্ষের সাথে যুদ্ধ করতে যাব না। এটাই ইসলাম ও মুসলমানদের নীতি। সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি ও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. আগে ফাতেমিদেরকে হটিয়েছিলেন।

ইলম অর্জনের পর সুলতান ইবাদতে নিমগ্ন হয়েছিলেন। ইবাদতে আমাদের অভাব রয়েছে। উম্মতের এ সকল মহানায়ক ইবাদতে সময় দিতেন। সুলতানের বাহিনী সারাদিন যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেওয়ার তোড়জোড় করছিল। কিন্তু সুলতান তাদের সকলকে জাগিয়ে তুললেন। বললেন, না! বিশ্রামের সময়

নেই। তোমরা যখন কবরে যাবে তখন বিশ্রামের জন্য অনেক সময় পাবে। এই জীবনে বিশ্রামের সময় নেই। উঠে নামাজ পড়ো এবং জিকির ও দোয়া করো।

আমাদেরকেও জিকির ও দোয়া করতে হবে। সকালে, বিকেলে, যখন গাড়ি চালাব তখন গল্প করার বদলে জিকির ও দোয়া করতে হবে। সুলতান সালাহুদ্দিন এক এলাকা থেকে অপর এলাকায় ভ্রমণ করার সময় সর্বাবস্থায় সম্মুখ সারিতে থাকতেন। তিনি তার সঙ্গে অনেক আলেম-ওলামাকে রাখতেন। তাদেরকে বলতেন, আমাকে কিছু সিরাত শোনান। তিনি অযথা হাসিঠাট্টা, তামাশা ও কারও পরনিন্দা করতেন না। আমাদেরকেও তার অনুসরণ করতে হবে। অযথা হাসিঠাট্টা, তামাশা ও পরনিন্দা থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি বলতেন, কিছু সিরাত পড়ুন। আমাকে কিছু হাদিস পড়ে শোনান। চলুন, এই ফিকহি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এভাবেই তারা সময় কাটাতেন।

আমাদেরকে তার মতো হতে হলে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে হবে। প্রিয় পাঠক, রাতে উঠে নামাজ পড়ুন। ইলমও থাকতে হবে এবং ইবাদতও থাকতে হবে। জিহাদের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। জিহাদের প্রতি ভীতি লালন করে কাপুরুষ হওয়া যাবে না। জিহাদ হলো দাওয়াতুল ইসলামের মূল বিষয়, যা ইসলামের সম্মান বৃদ্ধি করে। জিহাদের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। এক যুদ্ধে সুলতান যুদ্ধ করছিলেন এবং সময়টা ছিল ঠান্ডার। অথচ সুলতান হিসেবে সালাহুদ্দিন যত বিলাসিতার উপকরণ ও সম্পদ আছে তা নিয়ে বাড়িতে থাকতে পারতেন। তিনি সৈন্য পাঠিয়ে বাড়িতে থাকতে পারতেন। অথচ তিনি হিমশীতল আবহাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে যুদ্ধ করেছিলেন। তার আশেপাশে তার উপদেষ্টাগণ ভাবছিলেন, কেন তিনি সবকিছু ছেড়েছুড়ে এমন হিমশীতল আবহাওয়ায় যুদ্ধ করছেন!

সুলতান তাদের হাবভাব দেখে বুঝে ফেললেন, তারা মনে মনে কী ভাবছে। তাই তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার উদ্দেশ্য হলো, এই মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওপারের ভূমিতে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-ও এ ধরনের কথাবার্তা বলতেন। এভাবে তারা মুসলিম উম্মাহকে শত্রুর বিরুদ্ধে উজ্জীবিত রাখতেন। তাদের কাছে আরামদায়ক বিছানা ও বিলাসদ্রব্যের চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা অনেক বেশি আনন্দদায়ক ছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বলতেন,

مَا مِنْ لَيْلَةٍ يُهْدَى إِلَيَّ فِيهَا عَرُوسٌ أَنَا لَهَا مُحِبٌّ، أَوْ أُبَشَّرُ فِيهَا بِغُلَامٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ كَثِيرَةِ الْجَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ أُصَبِّحُ فِيهَا الْعَدُوَّ.

> এমন রাত, যে রাতে আমার ভালোবাসার নববধূর সাথে বাসর যাপনের সুযোগ দেওয়া হয়, অথবা এমন রাত, যে রাতে আমাকে কোনো পুত্রসন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, এর চেয়ে আমার কাছে সেনাদলের সাথে কাটানো সেই তীব্র কনকনে তুষার পড়া শীতের রাত প্রিয়, যার সকালে আমি শত্রুর ওপর আক্রমণ চালাব।[২৬]

ইসলামের আগে খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন একজন নারীসঙ্গপিয়াসি ব্যক্তি। তার কাছে যখন ইসলাম এসেছে তখন তিনি হয়ে গেলেন জিহাদপিয়াসি। তিনি নারীসঙ্গে বুঁদ হয়ে থাকা এক ব্যক্তি হয়েও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি জাহেলিয়াতের যুগের মতো সুন্দরী কুমারী নারীর সঙ্গে রাত্রিযাপনের চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে অধিক ভালোবেসেছেন। বলেছেন, আমি যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকি, তখন আমি সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে আমার বিয়ের প্রথম রাত কাটানোর চেয়েও বেশি ভালোবাসি লড়াইয়ের ময়দানকে।

অপরদিকে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবিও এভাবে সারারাত কনকনে শীতের মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। সূর্যালোকের জন্য অপেক্ষা করেছেন, যেন আলো ফোটার সাথে সাথে শত্রুদের আক্রমণ করতে পারেন। মহান আল্লাহর কসম! রাতের তীব্র শীত, হাওয়া ও শিলাবৃষ্টির রাতে শত্রুকে আক্রমণ করা তাদের কাছে একজন সুন্দরী মহিলার সাথে উষ্ণ বিছানায় রাত কাটানোর চেয়ে প্রিয় ছিল। এরাই আমাদের মহানায়ক। এই মহানায়কদের জ্ঞান, ইবাদত, জিহাদ—এসবই আমাদের প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে, এই উম্মাহর মধ্য থেকেই সালাহুদ্দিনের মতো বীরদের পাঠাবেন। ইসলামের বিজয়ের চেতনা আমাদের আশার ঝান্ডাকে উঁচু রাখে। নবী আ. আমাদের বলে গেছেন, ইসলাম বিশ্বের প্রতিটি অংশে শাসন করবে। আমরা যখন বলি, ইসলাম পৃথিবীর সমস্ত অংশে শাসন করবে, তা আমরা নিজেদের পকেট থেকে বের করে বলি না।

২৬. *কিতাবুল জিহাদ*, ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.।

হাদিস থেকে বলি। আর এটা ঘটবেই। কেউ যদি বিশ্বাস না করে, তবে সে মুসলিম নয়। কারণ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন, সকলকিছুর ওপরে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন হবেই। স্বেচ্ছায় হোক বা জোর করে, ইসলাম বিশ্বকে শাসন করবেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, ইসলাম যেহেতু বিশ্বকে শাসন করবে, তাহলে আমাদের তো আরাম করে বসে থাকার কথা। কিন্তু তা নয়। আমরা নিজেদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করার অর্থ হলো এই সম্মানের অংশ হওয়া। ইসলাম আমাকে এবং আপনাকে ছাড়াই বিজয় অর্জন করতে সক্ষম, কিন্তু আমরা ইসলামের সাথে না থাকলে আমরা নিজেরাই হেরে যাব। আমরা যদি এই সময়ে বিজয়ী নাও হই, আমাদের নাতি-নাতনিরা বিজয়ী হতে পারে। কিন্তু মূল ব্যাপার হলো, আল্লাহর কাছ থেকে এই আজর বা প্রতিদান পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই সম্মানের অংশ হতে হবে, যাতে আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারি এবং বলতে পারি যে, হে আল্লাহ, আমরা আপনার জন্য কাজ করেছি। আমরা আপনার জন্য এটা করেছি, ওটা করেছি।

সুতরাং ইসলামের খেদমত করতে হলে সকলের প্রতি প্রথম পরামর্শ থাকবে, ইলম তলব করা। এটাই প্রথম কাজ। বিশেষ করে আমাদেরকে ইলমের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে হবে। ইলম বলতে এখানে প্রতি দুই মাস পরপর কোনো লেকচার শোনার নাম নয়, বরং সুপ্রতিষ্ঠিত ইলম সম্পর্কে বলা হচ্ছে। একটার পর একটা বই পড়তে হবে। প্রথমে ফিকহ থেকে শুরু করে শেষ করা। অতঃপর আকিদা, তাফসির এভাবে ইলমের বিভিন্ন শাখায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করা। নিয়মিত হালকায় বসা। অনুপ্রেরণামূলক আলোচনার মতো অন্যান্য বক্তৃতাগুলোও শোনা। এভাবেই আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকতে পারব এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্য থেকে কোনো মহানায়কের মাধ্যমে ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং আমার-আপনার বংশধরদের থেকে সালাহুদ্দিন, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, নুরুদ্দিন জিনকি এবং উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর মতো বীর জন্ম দিন। তাদের কবরে অজস্র রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের সকল উত্তম কর্মকাণ্ডের সওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে দিন। আমিন।

পারস্যবিজয়ী নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি এবং অগ্রসেনানী

বীর উকবা ইবনে নাফে

প্রিয় পাঠক, মহান আল্লাহ তার কালামে হাকিমে ইরশাদ করছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তা হলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলোকে ক্রটিমুক্ত করবেন আর তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে সে মহাসাফল্য লাভ করে।[২৭]

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.

মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আর কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোনো পরিবর্তন করেনি।[২৮]

পাঠক, এ পর্যন্ত আমরা বেশ কয়েকজন কিংবদন্তিকে নিয়ে আলোচনা করেছি।

২৭. সুরা আহজাব : ৭০, ৭১।

২৮. সুরা আহজাব : ২৩।

ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগতিতিক্ষা ও কুরবানির ইতিহাস পড়েছি। আমরা যদি এই ব্যক্তিবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তবে কুরআনে বর্ণিত প্রতিদান ও প্রশংসার ভাগীদার আমরাও হব। মনে রাখবেন, আমরা পৃথিবীর ক্ষণজন্মা এই মহানায়কদের কথা স্রেফ আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বলিনি, বরং এই নায়কদের গল্পগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার জন্যই বলা, শোনা ও পড়া হয়েছে।

তো আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করেছিলাম সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ইবনে ইমাদ উদ্দিন জিনকি রহ.-কে নিয়ে। দ্বিতীয়ত, সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। তারা উভয়ে ছিলেন ৫০০ হিজরির ব্যক্তি। সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি ছিলেন ৫১১ হিজরি আর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন ৫২৩ হিজরিতে জন্ম নেওয়া মানুষ। আমরা এই সিরিজের পুরোটাতেই চাইলে সাহাবিদের নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম। কিন্তু আমরা সাহাবিদের আলোচনা না করে তাদের পরবর্তী সময়ে ইসলামের জন্য অবদান রাখা ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করেছি। অথচ তারা সাহাবা নন। তারা আর দশজনের মতোই সাধারণ মানুষ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সময় এবং জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের ভালো কাজের পরিমাণ আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। তারা ইসলামের জন্য লড়াই করে জয়লাভ করেছেন। সুতরাং সব মিলিয়ে তাদের জীবন আমাদের জন্য পাঠ্য। তাদের জীবনের সাথে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনও জুড়ে আছে। তাই আজ আমরা দুজন সাহাবিকে নিয়ে কথা বলব। এই দুজন সাহাবির নাম বলার প্রয়োজন মনে করছি না, তবে অনেকে তাদের নাম নাও শুনে থাকতে পারেন।

তবে তার আগে আরও কয়েকজন সাহাবির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেখে নেওয়া যাক। প্রথমজন হলেন জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ উহুদের ময়দানে গিয়েছিলেন। তিনি এবং তার পিতা উভয়েই যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। জাবিরের পিতা আবদুল্লাহর নয়জন কন্যা ছিল, অর্থাৎ, জাবিরের নয়জন বোন ছিল। ছেলেও যুদ্ধ করতে যেতে চান, বাবাও যুদ্ধে যেতে চান। কিন্তু এই নয়জন নারীর সাথে তো একজনকে রেখে যেতে হবে, মদিনায় একা তো ফেলে যাওয়া যাবে না। এর সুরাহাকল্পে উভয়ের মধ্যে লটারি করা হয়, এতে বাবা জয়ী হন এবং তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

খবর পেয়ে ছেলে বাবার কাছে ছুটে আসে। বাবার মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই লাশটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। নবীজি সেই দৃশ্য দেখে বললেন, কেঁদো না জাবির, কোঁদো না। মহান আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তোমার বাবার রুহ আকাশে নিয়ে গেছেন। জাবির, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমার বাবার সাথে এমনভাবে কথা বলছেন যে, তাদের মাঝে কোনো আবরণ নেই। যারা আল্লাহর সাথে কথা বলে, তাদের মাঝে কিছু না কিছু মধ্যস্থতাকারী থাকে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমার বাবার সাথে এমনভাবে কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই।

তিনি আরও বললেন, আল্লাহ তোমার বাবাকে বলেছেন, তুমি কী চাও, আবদুল্লাহ? আবদুল্লাহ বলল, আমি আগের জীবনে ফিরে যেতে চাই এবং শহিদ হতে চাই। তখন আল্লাহ বললেন, তুমি জানো, মারা গেলে কেউ কখনো ফিরে যায় না। আবদুল্লাহ তখন বলল, আল্লাহ, আমি ফিরে গিয়ে তাদের বলতে চাই, শহিদ হওয়ায় কী পুরস্কার পেলাম!

বস্তুত শহিদ হওয়ার পরও দুনিয়াতে ফিরে এসে শাহাদাতের পুরস্কারের কথা জানানোর জন্য পুনরায় জীবন ফিরে পাওয়ার এই বাসনার কারণে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

> যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা কখনোই তাদের মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত।[২৯]

শহিদের চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। এই ব্যাপারে একটি হাদিস আছে, যা আমাদের সকলের জানা থাকা উচিত। সবসময় এ হাদিসটি আমাদের স্মরণে রাখা উচিত,

---

২৯. সুরা আলে-ইমরান : ১৬৯।

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتُّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَه فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِه.

> আল্লাহ তাআলার নিকট একজন শহিদের জন্য ছয়টি মর্যাদা রয়েছে : (তার মধ্যে প্রথমটি হলো) (শত্রুর আঘাতে) তার শরীর থেকে প্রথম ফোঁটা রক্ত বের হওয়ার সাথে সাথে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়।[৩০]

এ হাদিসটি একটি সহিহ হাদিস। প্রিয় পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার রক্তের প্রথম ফোঁটার সাথে সাথে আপনার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়া এবং শহিদ হওয়ার সাথে সাথে আপনার পূর্বে যারা বিগত হয়েছেন তাদেরকে এবং ফেরেশতাদের দেখতে পাবেন। এবং পবিত্র রাসুলগণ শাহাদাতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাও পেতে শুরু করবেন। সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার। জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে আরশের চারপাশে বিদ্যমান ঝাড়বাতির আশেপাশে উড়ে বেড়াতে থাকবেন। কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আপনি সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতে বিচরণ করবেন। সুবহানাল্লাহ!

সাধারণ মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তারা তাদের রুহ সহকারে কবরে থাকবে, আর শহিদগণ জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে আল্লাহর আরশের চারপাশে উড়ে বেড়ায়। সাহাবায়ে কেরাম এই প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা শুনে শাহাদাতের জন্য উদগ্রীব থাকতেন। এ কারণেই তারা সাহাবা ছিলেন। অনেকেই মনে করে, তাদের সময় আমাদের সময়ের চেয়ে সহজ ছিল। অথচ তাদের সময় একটি কঠিন সময় ছিল। তারা তাদের জীবন ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ-উল্লাসে কাটিয়ে দেননি। তারা অবৈধ নারীসঙ্গ পছন্দ করতেন না, তারা মদ পছন্দ করতেন না। তারা পার্থিব জীবনের ভোগবিলাসের চেয়ে পরকালীন জীবনের ভোগবিলাসকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তারা বোকা ছিলেন না। তারা জানতেন পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস আখেরাতের ভোগবিলাসের তুলনায় কিছুই নয়। তারা এই দুনিয়ার নারীসঙ্গের চেয়ে আখেরাতের ৭০ জন হুরের সঙ্গ পেতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল জান্নাতের শরাব। তাদের লক্ষ্য ছিল

---

৩০. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৭১৮২।

জান্নাতের বালাখানা, জান্নাতের বাগিচা। এটাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

আরেকজন সাহাবি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। তিনি একজন বেদুইন সাহাবি ছিলেন। বেদুইনরা সাধারণত একগুঁয়ে ও ইসলাম সম্পর্কে তুলনামূলক কম জানত। এক বেদুইন একবার মসজিদে প্রস্রাব পর্যন্ত করেছে। আরেকবার তাদের মধ্যে একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, আরে মুহাম্মাদ, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আবার কেউ কেউ নবীর একদম কাছে এসে বসত। তার বাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে ঘুম থেকে জাগাত। এরপর বলত, আমাদের একটি প্রশ্ন আছে। আপনি বেরিয়ে আমাদের কাছে আসুন।

বেদুইনরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ভালো করে তাকাতেও পারত না। সাহাবিগণ তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বেদুইনরা নবীর বর্ণনাও দিতে পারত না। তারা বলত, আমরা তার সাথে ২০ বছর ছিলাম। তিনি দেখতে কেমন তা আমরা বর্ণনাও করতে পারি না। তারা রাসুলের মুখপানে তাকাতে পারেনি। তারা খুব লাজুক ছিল। তারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রচণ্ড ভালোবাসত। সাধারণত, আপনি যদি কাউকে এতটা শ্রদ্ধা করেন এবং সাথে ভালোও বাসেন, তবে আপনি তার দিকে তাকাতে পারবেন না। কিছু সাহাবি নবীর সাথে ২০ থেকে ২৩ বছর থাকার পরেও বর্ণনা করতে পারেননি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে কেমন ছিলেন! হ্যাঁ, তারা এমনই ছিলেন।

বেদুইনদেরকে সাহাবিরাও ভালোবাসতেন। কারণ তারা তাদের প্রশ্নে খোলামেলা ছিলেন। তারা কোনো কথা মনের ভেতর লুকিয়ে রেখে অন্য কথা বলতেন না। তাদের মনের কথা এবং মুখের কথায় কোনো পার্থক্য থাকত না বলেই সাহাবায়ে কেরাম রা.-ও তাদেরকে ভালোবাসতেন। বেদুইনরা সোজাসাপটা কথা বলতেন বটে, কিন্তু তারা একেবারেই গেঁয়ো ছিলেন না।

সম্পাদকের মন্তব্য

এখানে আহমাদ মুসা জিবরিল সাহেবের কথাগুলো কিছুটা অস্পষ্ট। তিনি একদিকে একগুঁয়ে স্বভাবের বেদুইন সাহাবিদের কিছুটা বেপরোয়াপনা ও নগরসভ্যতার সংস্পর্শহীনতার কথা বলছেন, অন্যদিকে তাদেরকে এতটা লাজুক বলতে চাচ্ছেন যে, তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকাতেই পারতেন না, বিধায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেও তারা নবিজির দেহকাঠামোর বর্ণনা দিতে পারতেন না। কিন্তু এখানে সমস্যা হলো, বেদুইন সাহাবিরা মূলত দীর্ঘ সময় অবস্থানই করতেন না; বরং প্রয়োজন শেষ হলে আবার ফিরে যেতেন। আর তাকাতে না পারার বর্ণনাগুলো সাধারণ সাহাবিদের থেকেই বর্ণিত, যারা তার সাথে দীর্ঘদিন থেকেছেন।

দ্বিতীয়ত, সাহাবায়ে কেরামের থেকে এরূপ বর্ণনা আছে যে, আমি দীর্ঘদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করেছি বটে, কিন্তু তিনি কেমন ছিলেন, সে কথা বলতে পারব না। এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এতটাই ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে, কারও দেহকাঠামো বর্ণনা করার জন্য তার দিকে যেভাবে তীক্ষ্মদৃষ্টির সাথে তাকাতে হয় ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, তারা সেভাবে তাকাতেই পারতেন না সাহস করে, বিধায় বর্ণনাও করতে পারতেন না। এটা নিছক তাদের বিনয়, অন্যথায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহকাঠামোর বর্ণনা আমরা অনেক সাহাবির বর্ণনায়ই পেয়ে থাকি।

তৃতীয়ত, বেদুইন সাহাবিরা মনের ভেতর কথা লুকিয়ে না রাখার ব্যাপারটি অন্য সাহাবিদের দ্বিমুখিতার প্রতি ইঙ্গিত নয়। বরং, গ্রাম্য মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সহজ-সরল স্বভাবের কারণে তারা শহুরে কৃত্রিমতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। জটিল উপস্থাপনায় না গিয়ে সরল মনে কথাটি বলে ফেলতেন। অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরাম বেদুইন লোক আগমনের অপেক্ষায় থাকার কারণ হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক প্রশ্ন করা পছন্দ করতেন না, তাই সাধারণ সাহাবিরা বেদুইনদের মাধ্যমে প্রশ্ন করানোর সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। কারণ বেদুইন গ্রাম্য লোকদের ক্ষেত্রে নবিজি নিয়মিত সাহাবিদের প্রতি দেখানো কঠোরতাটি দেখাবেন না। আল্লাহু আলাম। (সম্পাদক)

তাদের মধ্যে ঈমানি চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল ছিল। তারা দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে যোগদান করতেন না। যেমন একবার এক বেদুইনকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনিমতের অংশ প্রদান করেন, যে যুদ্ধে উক্ত বেদুইন অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাতে তিনি হতবাক হয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, আপনি আমাকে এই সম্পদ কেন দান করছেন? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারণ এটা তোমার অংশ। উক্ত বেদুইন বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এইজন্য আপনাকে অনুসরণ করিনি যে, আপনি আমাকে কোনোকিছু দেবেন। বরং আমি দ্বীনের জন্য আপনাকে অনুসরণ করেছি এবং দ্বীনের পথে এখানে এসে যেন বিদ্ধ হয়—এ কথা বলে তিনি তার কণ্ঠনালির দিকে একটি তির দিয়ে ইশারা করেন—ফলে মৃত্যুর মাধ্যমে যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

এরপর যুদ্ধে তিনি শহিদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহিদদের দেহ পরীক্ষা করছিলেন। তখন উক্ত বেদুইনের দিকে চোখ পড়ার সাথে সাথে তিনি বললেন, এ কি সেই ব্যক্তি? সাহাবায়ে কেরাম হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। আল্লাহর কসম! তার কণ্ঠনালিতে তিরটি ঠিক সেখানেই বিদ্ধ হয়েছিল, যেখানে তিনি ইশারা করে আল্লাহর রাসুলকে দেখিয়েছিলেন। হুবহু কেন মিলে গিয়েছিল? কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন,

إن تصدق الله يصدق.

তুমি যদি আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে সত্যায়িত করবেন।[৩১]

অতএব, আমরা যদি সত্যিই শহিদ হতে চাই, আমরা যদি সত্যিই একজন শহিদের পুরস্কার চাই, তবে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে তা দান করবেন। এটি নবীদের পরেই তৃতীয় অবস্থান। নবীগণের পরে সর্বোত্তম অবস্থান সিদ্দিকিনদের, যারা উচ্চপর্যায়ের ঈমানদার। এবং তৃতীয় অবস্থান শহিদগণের। অতঃপর সালিহিনদের। এরপর সাধারণ মুসলমানদের। তো উক্ত বেদুইন

৩১. দ্রষ্টব্য, *সুনানে নাসায়ি*, ১৯৫৩।

তাদের মধ্যে ঈমানি চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল ছিল। তারা দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে যোগদান করতেন না। যেমন একবার এক বেদুইনকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনিমতের অংশ প্রদান করেন, যে যুদ্ধে উক্ত বেদুইন অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাতে তিনি হতবাক হয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, আপনি আমাকে এই সম্পদ কেন দান করছেন? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারণ এটা তোমার অংশ। উক্ত বেদুইন বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এইজন্য আপনাকে অনুসরণ করিনি যে, আপনি আমাকে কোনোকিছু দেবেন। বরং আমি দ্বীনের জন্য আপনাকে অনুসরণ করেছি এবং দ্বীনের পথে এখানে এসে যেন বিদ্ধ হয়—এ কথা বলে তিনি তার কণ্ঠনালির দিকে একটি তির দিয়ে ইশারা করেন—ফলে মৃত্যুর মাধ্যমে যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

এরপর যুদ্ধে তিনি শহিদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহিদদের দেহ পরীক্ষা করছিলেন। তখন উক্ত বেদুইনের দিকে চোখ পড়ার সাথে সাথে তিনি বললেন, এ কি সেই ব্যক্তি? সাহাবায়ে কেরাম হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। আল্লাহর কসম! তার কণ্ঠনালিতে তিরটি ঠিক সেখানেই বিদ্ধ হয়েছিল, যেখানে তিনি ইশারা করে আল্লাহর রাসুলকে দেখিয়েছিলেন। হুবহু কেন মিলে গিয়েছিল? কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন,

إن تصدق الله يصدق.

তুমি যদি আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে সত্যায়িত করবেন।[৩১]

অতএব, আমরা যদি সত্যিই শহিদ হতে চাই, আমরা যদি সত্যিই একজন শহিদের পুরস্কার চাই, তবে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে তা দান করবেন। এটি নবীদের পরেই তৃতীয় অবস্থান। নবীগণের পরে সর্বোত্তম অবস্থান সিদ্দিকিনদের, যারা উচ্চপর্যায়ের ঈমানদার। এবং তৃতীয় অবস্থান শহিদগণের। অতঃপর সালিহিনদের। এরপর সাধারণ মুসলমানদের। তো উক্ত বেদুইন

৩১. দ্রষ্টব্য, *সুনানে নাসায়ি*, ১৯৫৩।

আল্লাহর সাথে সত্যবাদী ছিলেন, তাই আল্লাহও তার প্রতি সততা প্রদর্শনকারী হয়ে যান।

সাহাবিরা দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ, আমি যুদ্ধে যেতে চাই, আমি আপনার পথে যুদ্ধ করতে চাই; শত্রুরা আমাকে আক্রমণ করতে এলে আর আমি প্রথমজন, দ্বিতীয়জন এবং তৃতীয়জনকে হত্যা করার পর চতুর্থজন এসে আমার পেট কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলুক, আমার কান ও নাক কেটে ফেলুক, যাতে আমি আপনার সাথে আঘাতপ্রাপ্ত দেহ নিয়ে সাক্ষাৎ করতে পারি, এবং আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কেন তুমি এই কাজ করেছ? আর আমি আপনাকে বলব, হে আল্লাহ, আপনার জন্য, আপনার জন্য আমি শত্রুদের সাথে লড়াই করেছি, আপনার কালিমাকে আপনার জমিনে বুলন্দ করার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি; সুতরাং আপনি আমাকে আপনার জান্নাত দান করুন।

প্রিয় পাঠক, জান্নাত কত দামি দেখুন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো অবস্থা আসেনি?! অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসুল ও তার সাথিসঙ্গী ঈমানদাররা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখনো আসবে?! জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।[৩২]

প্রিয় পাঠক, আপনি কি মনে করেন যে, আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন, অথচ তখন আমাদের চেচনিয়ার ভাইয়েরা উত্তপ্ত সময়ে দিনাতিপাত

---

৩২. সুরা বাকারা : ২১৪

করছে?! যে জান্নাতে আমরা প্রবেশ করতে চাই, তাতে আমরা কি অতি সহজেই প্রবেশ করতে পারব?! অথচ আমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে, তাদের মতো অবস্থা এখনো আমাদের হয়নি!

কেয়ামতের দিন যখন আমি আল্লাহর কাছে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর্জি রাখব তখন হয়তো আবদুল্লাহ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলবেন, আমিও তো জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই। আমি আমার নয়জন মেয়েকে মদিনায় রেখে আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছি। হে আহমাদ, (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল) তুমি কী করেছ যে তুমিও জান্নাতে যেতে চাও?!

দেখুন, এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা অর্থকষ্ট, অভাবগ্রস্ততা এবং সর্বোচ্চ কষ্ট-ক্লেশ বোঝাতে 'বাসাউন' ও 'দাররাউন' শব্দদ্বয় এনেছেন। আরবি ভাষায় কষ্ট এবং দুঃখ বোঝাতে এই দুটি শব্দের চেয়ে আর কোনো কঠিন শব্দ আনা যায় না। যেমন সুরা আলে-ইমরানে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সর্বোচ্চ কঠিন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, এমনকি রাসুল ও তার সাথিসঙ্গী ঈমানদাররা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? চিন্তা করুন, কত কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থা আল্লাহর রাসুল ও তার সাহাবিগণ পার করেছেন! ইসলামের জন্য, দ্বীনের জন্য কতটুকু কুরবানি তারা দিয়েছেন। হজরত খাব্বাব রা. ছিলেন ঐকজন ক্রীতদাস। তার ঈমান আনার পর মক্কার মুশরিকরা তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের-ওপর শুইয়ে রেখেছিল। তিনি কষ্ট ও নির্যাতন সইতে না পেরে নবীর কাছে অভিযোগ নিয়ে আসেন। তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। খাব্বাব এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কাছে বিজয় প্রার্থনা করুন। দোয়া করুন আমাদের জন্য। তার কথা শুনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়া থেকে উঠে বসে তাকে পূর্ববর্তীদের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, এতটুকুতেই তোমরা পরাস্ত হয়ে পড়ছে?! অথচ পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা নবীগণের ওপর ঈমান এনেছিল, তাদেরকে তাদের জাতিগোষ্ঠী কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। তাদের জন্য গর্ত খোঁড়া হতো। অতঃপর সে গর্তে তাদেরকে রেখে করাত এনে মাথার ওপর করাত চালিয়ে জীবন্ত মানুষটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো!

হজরত খাব্বাব রা. ইসলামের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করেছিলেন। তিনি একবার উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর সাথে বসা ছিলেন। সে সময় উমর

বললেন, আমি বিলালের চেয়ে কঠিন শাস্তি পেয়েছে বলে কাউকে জানি না। বস্তুত অধিকাংশ সাহাবি আবিসিনিয়া কিংবা অন্য কোথাও চলে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা যখন সরাসরি ইসলামের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং কাফেরদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে সরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, তখন কয়েকজন সাহাবি ব্যতীত প্রায় সকলেই সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু হজরত বিলাল রা. সেই সুযোগ পাননি। তাকে মুশরিকরা কঠিন শাস্তি দেয়। কারণ বিলালের মতো অধিকাংশ কৃতদাস সাহাবিই তা থেকে বের হওয়ার পথ পাননি। তো যাই হোক, হজরত বিলালের শাস্তির কথা সকলের মনে ছিল। তাই উমর রা. বললেন, বিলালের চেয়ে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত কেউ আছে বলে আমি জানি না। এ কথা শুনে হজরত খাব্বাব রা. নিজের জামা খুলে দেখান। জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর তাকে টানাহ্যাঁচড়া করার কারণে তার শরীরের চর্বি গলে আগুন নিভে গিয়েছিল এবং তার দেহ মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছিল। তার পিঠ, পেট, বুক ও মুখে সেসবের ক্ষত ছিল।

প্রিয় পাঠক ভেবে দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম রা. এত কষ্টের মধ্যেও সবর করেছিলেন, দ্বীন ইসলামের বিজয়ের জন্য নিজেদের সর্বোচ্চটুকু ব্যয় করেছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো জেনে নেননি?![৩৩]

বস্তুত আল্লাহ যেন আমাদের বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে প্রশ্ন করছেন, ইসলামের জন্য তোমরা কী করেছ? অথচ ভাবছ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে! আল্লাহ যেন বলছেন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে, নাকি তোমরা ভেবেছিলে যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমরা সময়মতো নামাজ পড়তে পারো না? নাকি তোমরা ভেবেছিলে যে, তোমরা জান্নাতে

৩৩. সুরা আলে-ইমরান : ১৪২।

প্রবেশ করবে, অথচ তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারো না? তোমরা কাফের এবং ইহুদিদের ঘৃণা করতে পারো না? বলুন, আমরা আল্লাহর শত্রুদের প্রতি অনুগত থেকে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা পোষণ করছি! এটা তো বড়ই বিস্ময়কর বিষয়!

হ্যাঁ, আমরা সেই মহানায়কদের কথা বলছি। সাহাবায়ে কেরাম রা.। তাদেরকে তাদের নামের কারণে বিশেষ কোনো পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়নি। তাদের নাম আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলিই ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সর্বোচ্চ বানিয়েছেন তাদের কর্মের কারণে। ইসলামের আগে তারা নানান ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত ছিলেন। মানবীয় খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা তাদের অন্তরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইসলামে প্রবেশের পূর্বে তারা তৎকালীন বিশ্বের কাছে এতটাই তুচ্ছ ছিলেন যে, দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত মক্কা শহরে কেউ কখনো আক্রমণ করেনি এবং কেউ কখনো ওই এলাকার দখলও নিতে চায়নি। অর্থাৎ তাদেরকে কেউ মূল্যায়ন করত না। কিন্তু সেই তারাই পরবর্তী সময় অর্ধজাহান শাসন করেছেন। কারণ তারা আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত হেদায়েতকে অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

মুশরিকরা অপছন্দ করলেও অপর সমস্ত দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তার রাসুল প্রেরণ করেছেন।[৩৪]

যুগে যুগে ইসলামের সকল মহানায়ক ইসলামকে অন্য সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে যে দুজন মহানায়কের কথা আলোচনা করেছি, অর্থাৎ সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ., তারাও একই কাজ করেছিলেন। নুরুদ্দিন, সালাহুদ্দিন, তার চাচা আসাদুদ্দিন এবং সুলতান নুরুদ্দিনের বাবা ইমাদুদ্দিনসহ সবাই

---

৩৪. সুরা তাওবা : ৩৩।

ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়। আমরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের যুদ্ধরত পেয়েছি। অস্বীকার করার কিছু নেই। প্রেসিডেন্ট বুশ হোয়াইট হাউসে একবার বলেছিল, এটি একটি ক্রুসেড। তার মুখনিঃসৃত এই বক্তব্যের তুলনায় তার অন্তরের মাঝে বিদ্যমান ইসলামবিদ্বেষ প্রবল ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের মাঝে কোনো মহানায়ক নেই। তাদের এই বিদ্বেষের কথা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.

হে মুমিন সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা-ই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো।[৩৫]

এ আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী আমরা ক্রুসেডার পেয়েছি, কিন্তু সালাহুদ্দিন পাইনি। চলুন আমরা আমাদের পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাই। যে দুজন সাহাবিকে নিয়ে আজ আলোচনা করার কথা, তাদের আলোচনা শুরু করি।

বীর সাহাবি নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি

প্রথমজন হলো নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি রা.। তিনি কোনো ফুটবল তারকা নন, তিনি কোনো বাস্কেটবল খেলোয়াড়ও নন। তিনি ছিলেন একজন সাহাবি। তিনি এক বীরযোদ্ধা এবং বিজয়ী সাহাবি। তিনি ছিলেন ইরাক বিজয়ী বীর। এবার তিনি কীভাবে মুসলমান হলেন, সে কথা জানা যাক। নুমান রা. আল্লাহর

৩৫. সুরা আলে-ইমরান : ১১৮।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন যুবক বয়সে। তারা ছিলেন ১০ ভাই। ১০ ভাইকে নিয়ে তিনি নবীর কাছে আসেন এবং সকলেই তার সামনে বলে ওঠেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

মুজান গোত্র থেকে আগত দলে নেতা ছিলেন তাদেরই গোত্রের নেতা। তিনি তাদের সাথে ছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে আরও ৪০ জন বীরযোদ্ধাকে নিয়ে আসেন। তারা সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তারা কেউ আরাম করে গা এলিয়ে বসে থাকেননি। তারা অসাধারণ সাহাবি ছিলেন, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পর বুঝতেন, কালিমা পড়ার মানে হলো জীবনকে লা ইলাহা হা ইল্লাল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সময় থেকেই তারা আর জানতেন না, বিশ্রাম কী জিনিস। এমন একটি যুদ্ধও ছিল না, যেখানে হজরত নুমান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ না করে ঘরে বসে বিশ্রাম করেছেন। শুধু আল্লাহর রাসুলের সঙ্গেই নয়, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর থেকে শুরু করে ইনতেকালের সময় পর্যন্ত ছোট-বড় যেকোনো যুদ্ধে নবীজি যাদেরকে নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে নুমান ছিলেন প্রথম সারির সেনা। অথচ আমরা এই মহান সাহাবি নুমান ইবনে মুকরিনকে চিনি না। কারণ আমরা জিহাদ কী জিনিস, তা জানি না। আর জিহাদ না জানলে আমরা শুধু নুমান নন, অন্যদেরকেও চিনব না। এটাই আমাদের সমস্যা।

নুমান রা. নবীর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। এরপর আবু বকর রা. শাসনকার্যে আসেন। আবু বকরের খেলাফতকালে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ইরতিদাদের সমস্যা। মুরতাদদের সাথে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নুমান এবং বাম বাহুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার ভাই। যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁচটি উইং থাকে। রাইট উইংয়ে ছিলেন নুমান এবং লেফট উইংয়ে ছিলেন তার ভাই। আর তারা আবু বকর রা.-এর পূর্ণ খেলাফতকালে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আবু বকর রা.-এর ইনতেকালের পরেও তারা যুদ্ধ করা ছেড়ে দেননি। এরপর হজরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে চলমান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উমর রা.-এর আমলে তিনি নুমান রা.-কে ডেকে বলেন, হে নুমান, আমি আপনাকে বিজিত অঞ্চলসমূহ থেকে কর আদায়ের দায়িত্ব

দিতে চাই। কিন্তু তিনি জানতেন না, কীভাবে কর আদায় করতে হয়। কারণ তিনি সবসময় জিহাদে ব্যস্ত থেকেছেন। তিনি চাইতেন জিহাদে ব্যস্ত থেকেই তার জীবন কাটিয়ে দিতে। তাই তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, আমি এটাতে অক্ষম। আমাকে অন্য কোনো দায়িত্ব দিন।

এই বলে তিনি মদিনায় থেকে যান এবং পরবর্তী সময়ে তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আবু উবাইদা, আমর ইবনে আস রা.-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করেন। আজকের ইরাক এবং পারস্যের এলাকাগুলো জয় করেন। আজকের ইরাক ও ইরানের সীমান্তে এই মানুষগুলোই তাদের রক্ত ঝরিয়েছেন। চৌদ্দশ বছর আগের কথা এগুলো। অথচ আজ এই দেশগুলো আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমাদের শত্রুরা দখল নিয়ে ফেলেছে। আফগানিস্তানের মতো শীঘ্রই এই দেশগুলোও দখল করা হবে, ঠিক যেমন আজ আফগানিস্তান দখলে আছে। তারা ঠিক এভাবেই ইরাক দখল করবে।

ইরাক এবং পারস্যে নুমান ইবনে মুকরিন তার রক্ত ঝরিয়েছেন। পারস্যে গিয়ে পারস্য দখলে নিয়েছিলেন। পারস্য সাম্রাজ্য তখনকার সুপার পাওয়ার ছিল। সাহাবিরা তাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। পারসিয়ানরা সবসময় মুসলমানদের আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে ফিরে আসত। কিন্তু মুসলমানগণ তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতেন। তারা খলিফার কাছে এই প্রস্তাব দেন যে, সরাসরি যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হোক, আমরা পারসিকদেরকে পরাজিত করব। কিন্তু হজরত উমর ভিন্নকিছুর আশঙ্কা করছিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা., আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা., আমর ইবনুল আস রা. এবং পারস্য সীমান্ত থেকে নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি রা. হজরত উমরের কাছে চিঠি পাঠিয়ে পারস্য আক্রমণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু হজরত উমর রা. তাদেরকে থামতে বলেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে, মুসলিম ভূখণ্ড এত বড় হয়ে গেলে তিনি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। কিন্তু মুসলমানদের ক্রমাগত অগ্রগতির কারণে পারসিকরা নিজেদের মধ্যে একটি জোট গঠন করে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করেছিল। তারা ১ লাখ ২০ হাজার লোককে জড়ো করেছিল। তাদের সময়ের সুপার পাওয়ার ছিল তারাই। এই খবর যায় উমরের কাছে। পারসিকদের এই পদক্ষেপের প্রতি কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষেপের ছিল না। মুসলিম উম্মাহর ভূখণ্ড প্রতিরক্ষার গুরুদায়িত্ব সামনে এসে পড়ায় হজরত উমর রা. সকলের চিঠির জবাবে তাদেরকে আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং শুরার মাধ্যমে একজন নেতা নির্বাচন করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম

বললেন, উমর যাকে নির্বাচন করবেন আমরা তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেব। বস্তুত সাহাবায়ে কেরাম রা. নেতৃত্বের জন্য লড়তেন না। তাদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা।

পরবর্তী সময়ে তাদেরকে যে-সকল মহানায়ক অনুসরণ করেছেন, তারাও নেতৃত্বের প্রতি লালায়িত ছিলেন না। আমরা এর আগে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির গল্প পড়ে এসেছি। বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পথে যাত্রা প্রথম শুরু করেছিলেন সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি। এই যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। বাইতুল মাকদিস জয়ের স্বপ্ন নিয়ে সুলতান নুরুদ্দিন একটি মিম্বার নির্মাণ করেছিলেন, যা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই মিম্বার বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যান সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। অতঃপর সেটি তিনি বাইতুল মাকদিসে স্থাপন করেন। স্থাপন করে তিনি এক ব্যক্তিকে জুমার খুতবা দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার নাম ইবনে জাকি। ইবনে জাকি একজন বাগ্মী বক্তা ছিলেন। যেদিন তারা আকসায় প্রবেশ করেন সেই দিনটি ছিল ২৭ রজব। এই তারিখে তারা আকসা বিজয় করেন নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ৫৮৩ বছর পর এক জুমার দিনে। বহু লোকের ধারণা, ২৭ রজবে পবিত্র মিরাজের ঘটনা ঘটেছিল। তবে এর কোনো স্পষ্ট তারিখের কথা হাদিসে উল্লেখ নেই। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের এটাই ধারণা। সম্ভবত আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি ইঙ্গিতও হতে পারে যে, পবিত্র মিরাজের দিনে আকসার বিজয় হবে।

যাই হোক, ইবনে জাকি ওপরে উঠে আসেন। মিম্বারে উঠে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে করে আল্লাহর প্রশংসা করেন। তারপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবদান ও উমর ইবনে খাত্তাবের বিজয় সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন। খুতবায় তিনি সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ভূয়সীপ্রশংসা করতে যাননি। অথচ এ মুহূর্তে তিনিই বাইতুল মাকদিস জয় করেছেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তালোভী মানুষ ছিলেন না। তাই তিনি খুতবায় তার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ হওয়াও চাননি। এ কারণেই তিনি বাইতুল মাকদিসের বিজেতা হওয়া সত্ত্বেও নিজে খুতবা না দিয়ে ইবনে জাকিকে খুতবা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। নিজের প্রশংসা এবং অন্যের প্রতি বিষোদগার প্রকাশ করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ বর্তমান সৌদি আরবের জুমার খুতবায় তা-ই হয়! জুমার খুতবায় বলা হয়, হে আল্লাহ, সৌদি শাসকদের বিরুদ্ধে যারা আছে তাদের ধ্বংস করুন।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অত্যাশ্চর্য দোয়া করতে থাকে। কারণ তারা সেই নির্দেশের অধীন, যা তাদের অবশ্যই করতে হবে। অন্যথায় তারা সেখানকার অনেক মসজিদে খতিব হতে পারবে না। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ইবনে জাকি কিংবা অন্য কাউকে তা করতে দিতেন না। কারণ তিনি আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে চেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর জন্য আন্তরিক মানুষ ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মতোই মানুষ, যারা ইসলামের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পছন্দ করতেন, কিন্তু এটা চাইতেন না যে, সে কাজের প্রশংসা পাবেন মানুষ থেকে। তারা তাদের কাজগুলো লোকদের জানান দিয়ে করতেন না।

দেখুন, ইমাম মালিক রহ. বলেন, আমি যদি পারতাম আমার নাম ব্যতীত আমার ইলম ছড়িয়ে দিতে, তবে আমি তাই করতাম। তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন। তাবেয়িনদের মধ্যে এই উম্মতের একজন বড় আলেম। তিনিই এ কথা বলছেন।

বর্তমানে আমরা চাইলে এভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারি। আমরা অনলাইনে দাওয়াত দেবো, কিন্তু প্রোফাইল-স্ক্রিনে অন্য একটি নাম ব্যবহার করব। কেউ জানবে না আমি কে? সাত আকাশের ওপরে এমন একজন আছেন, যিনি জানেন এবং তিনি আমাদেরকে দেখেন। হ্যাঁ, এটাই ছিল ইমাম মালিক রহ.-এর আশা। অনেক সাহাবি এত গোপনে কাজ করতেন যে, কেউ তা জানতেও পারত না।

এটাই আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার সর্বোচ্চ শিখর। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, সাহাবায়ে কেরাম এমনই ছিলেন। যেহেতু তারা সাহাবি ছিলেন এবং সকলেই যোগ্য ছিলেন, তাই কোনো অভিযান বা কোনো কাজে ইচ্ছা হলে তারা আমির হতে চাইতে পারতেন। কিন্তু সাহাবিগণ সবাই আমিরের পদবি একে অপরের দিকে ঠেলে দিতেন। বলতেন, আমরা আমির হতে চাই না, আমরা যোদ্ধা হতে চাই।

সে সময় ইসলামি খেলাফতের সবচেয়ে বড় দুজন সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা.। আবু বকর রা. খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে সেনাপতি হিসেবে চাইতেন। উমর ইবনে খাত্তাব এলে তিনি তা পরিবর্তন করে আবু উবাইদাকে সেনাপতি করেন। এই সেনাপতি পরিবর্তনের ঘটনাটি বড়ই চমৎকার। এর বিশদ বর্ণনা ইতিহাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমরা সেদিকে যাব না। শুধু এতটুকুই বলব, যখন হজরত উমর ইবনে

খাত্তাব রা.-এর পক্ষ থেকে চিঠি আসে, খালিদ বিন ওয়ালিদকে অপসারণ করে আবু উবাইদাকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তখন তারা একে অপরকে বিব্রত না করার জন্য যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিঠি পকেটে লুকিয়ে রেখেছিলেন। চিঠিটি এমন অবস্থায় তাদের দুজনের একজনের কাছে পৌঁছেছিল যখন তারা যুদ্ধের ময়দানে লড়াইরত ছিলেন। উভয়ে একে অপরকে বলছিলেন, আমি আপনার পেছনে যুদ্ধ করি। খালিদ আবু উবাইদাকে বলেন, আমি আপনার পেছনে একজন নেতা বা সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করছি। আমাদের মধ্যে কে সেনাপতি আর কে যোদ্ধা, তা দেখার বিষয় নয়। বরং আমরা ইসলামের খেদমত করছি এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তো যাই হোক, আমরা পারস্য অভিযানের কথা বলছিলাম। উক্ত অভিযানের নেতা নির্বাচনের পরামর্শসভায় কথা উঠল, কাকে আমাদের নেতা হিসেবে রাখা উচিত? সকলেই বললেন, আপনি যাকে বেছে নেবেন উমর, আমরা তাকেই মানব। উমর রা. বললেন, আমি যেতে চাই। সকলে বললেন, না। আপনি যাবেন না। এই বিপজ্জনক যুদ্ধে আপনার যাওয়া উচিত হবে না। এখানে ১ লাখ ২০ হাজার যোদ্ধার বিপরীতে যুদ্ধ হবে। অগত্যা সাহাবিদের পীড়াপীড়িতে তিনি মদিনায় থেকে গেলেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি সম্পর্কে আপনাদের কী অভিমত? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি যদি তার প্রতি সন্তুষ্ট হন তবে আমরা তার প্রতি সন্তুষ্ট। উমর বললেন, নুমান কোথায়?

নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি রা. তখন মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। উমর রা. তার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। শেষ হলে উমর তাকে বললেন, তোমার জন্য আমি একটি অভিযান ঠিক করেছি। তিনি বললেন, উমর, যদি এটি ট্যাক্সের কাজ হয়, তবে আপনি জানেন আমি সেখানে যেতে পারব না। আমি এ কাজ করতে চাই না। বরং যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় তবে আমি তির ছুড়তে জানি, তির বুক পেতে নিতে পারি। আর এ কাজ আমি জানি, কীভাবে কী করতে হয়। যদি এমন কিছু হয় তবে আমি সেটা পরিচালনা করতে পারি। উমর বললেন, হ্যাঁ, এটাই। আমরা তোমাকে সেনাপতি হিসেবে চাই।

শোনামাত্রই নুমান রা. অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে যান। আরও বিশদ বিবরণ ছাড়াই তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে জিহাদে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। অথচ কোথায়

যেতে হবে তার কোনোকিছুই জানেন না তিনি। কী ধরনের মিশন তাও জানেন না। বরং যতক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করতে হবে ততক্ষণ প্রস্তুত!

পারস্যের পথে যাত্রা

উমর রা. বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং পরদিন সকালে মদিনার উপকণ্ঠ থেকে নুমানকে সেনাপতি করে পাঠিয়ে দেন। তিনি ৩০ হাজার মুসলিম সেনাকে পারস্য পর্যন্ত নিয়ে যান। তাঁবু ফেলে তারা ১ লক্ষ ২০ হাজারের বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে যান।

হজরত নুমান ইবনে মুকরিন রা. বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। বস্তুত যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার জীবন দিতে চান, তিনি তো আর বোকা নন। তিনি সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিয়ে গিয়ে বলে বসেননি যে, এসো, আমরা যুদ্ধ করে আমাদের জীবন বিলিয়ে দিই কিংবা আমার গর্দানে আঘাত করো। তিনি তা বলেননি। তিনি এই উম্মাহর বিজয় চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে নিজের জীবনের ব্যাপারে বেপরোয়া ছিলেন না। তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে পারস্যের বিস্তৃত অঞ্চলে পৌঁছে ১ লাখ ২০ হাজার পারসিক সেনার মুখোমুখি হন। ১ লাখ ২০-এর বিপরীতে তার মাত্র ৩০ হাজার! তার গুপ্তচর তাকে খবর দিলো, আপনাকে দুটো সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমত, তারা আমাদের বাহিরের চলার পথে তির নিক্ষেপ করার জন্য ওত পেতে আছে, যেখানে আমরা তাদের ওপর কোনো ধরনের হামলা করতে পারব না। আমাদের ঘোড়া, উট এবং সৈন্য অতিক্রম করতে পারবে না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, তারা সবাই বাংকারে অবস্থান নিয়েছে। তারা বেশ ভালোভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

প্রিয় পাঠক, ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি না জানি না। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামের লোকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছিল মাটির নিচের বাংকারগুলো। মাটির নিচে ভিয়েতনামীয়রা বিশাল ভবন বানিয়ে রেখেছিল। সেখানেই ভিয়েতনামি সৈন্য লুকিয়ে থাকত। সেখান থেকে গুলি করে মার্কিন সৈন্যদের হত্যা করত। তো পারসিক সৈন্যদেরও এমন বাংকার ছিল। তারা সেখানে আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের ওপরে হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল। বিপরীতে

মুসলমানদের নিরাপত্তার কিছু ছিল না। গুপ্তচরের দেওয়া তথ্য অনুপাতে সেনাপতি নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি সাহাবা ও উপদেষ্টাদের একত্র করেন। তারা পরামর্শ দিলেন, আমাদের পরিকল্পনা হলো, আমরা পরাজিত হওয়ার ভান করব এবং সেইসঙ্গে পিছু হটার চেষ্টা করব। আর আমরা পিছু হটলে তারা আমাদের আক্রমণ করার জন্য বাংকার থেকে বের হয়ে আসবে। তখন আমরা তাদের ঘিরে ফেলব।

প্রিয় পাঠক, দেখুন তারা কত কষ্ট করে আমাদের সময়ের মুসলিম শাসকদের সিংহাসনে বসে থাকার সুযোগ করে দিয়ে গেছেন। এই মাটিতে তারা রক্ত ঝরিয়েছেন। অথচ আমেরিকা কয়েক দিনের মধ্যে ইরাকে আমাদের মুসলিম ভাইদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে। যারা সেখানে আমাদের ভাইদের হত্যা ও আক্রমণ করতে চায় আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। ইরাক একটা মূল্যবান ইসলামি ভূখণ্ড। এটি আমাদের কাছে একটি মূল্যবান ভূমি। এটি মূল্যবান ভূমি এজন্য নয় যে, সেখানে সাহাবিরা মারা গেছেন। বরং তার চেয়ে বেশি মূল্যবান হলো সেখানে অবস্থানরত মুসলিমদের কারণে। আমাদের জন্য একজন মুসলমানের মৃত্যু সমগ্র উম্মাহর জন্যই একটি বিপর্যয়।

আবারও যুদ্ধে ফিরি। পরিকল্পনামাফিক যুদ্ধ শুরু হয়। সেনাপতি সম্ভবত চার পাঁচ লাইন বক্তৃতা দেন। তিনি বললেন, ভাইয়েরা, আপনারা জানেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে এসেছি। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর পতাকা উত্তোলনের জন্য, আল্লাহকে সমর্থন করার জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য, আল্লাহর নামে লড়াই করার জন্য রওয়ানা হয়েছি। আল্লাহ আমাকে এই যুদ্ধের ময়দানে শহিদদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

তারা এমন ব্যক্তি ছিলেন, যখন তারা আল্লাহর কাছে হাত তুলতেন, আল্লাহ ঘটনাস্থলেই তাদের ডাকে সাড়া দিতেন। নুমান রা. শাহাদাত চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, আল্লাহ তাআলা তার শাহাদাতের দোয়া কবুল করবেন। তাই তিনি পরবর্তী সেনাপতি নিয়োগ করে দেন। আর মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

হে নবী, আপনার জন্য ও আপনার অনুসারীদের জন্য আল্লাহই

যথেষ্ট।(৩৬)

কেন আল্লাহ তাআলা এ কথা বললেন? কারণ যখন পৃথিবী আমাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে গেছে, তখন আমাদের অবলম্বন একমাত্র আল্লাহই। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

তাদেরকে লোকে বলল, (মক্কার কাফের) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য পুনরায়) একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু এতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।(৩৭)

যখন মহাবিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে নেমে আসে এবং তাদের শক্তিমত্তা তাদের বিশ্বাস বাড়ায়, তখন আমাদের জন্য তা স্রেফ একটি পরীক্ষা। শুধু এইজন্য যে, এটি হতে পারে দিনের সূচনা ও রাত্রির অবসান। নতুন সূর্য উদিত হবে। সুড়ঙ্গের শেষপথে পৌঁছে গেছি। খুব তাড়াতাড়ি সূর্য দেখতে পাবে আমরা। পুরো পৃথিবী আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে আর আমরা বলি, 'হাসবুনাল্লাহ'। অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের যথেষ্ট আল্লাহই তাদের ধ্বংস করেন। কিন্তু এই হাসবুনাল্লাহ শুধু আমাদের জিহ্বা থেকে বের হলেই হবে না, বরং তা আমাদের হৃদয় থেকে বের হতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রা. মন থেকে, তাদের হৃদয় থেকেই হাসবুনাল্লাহ বলেছেন।

তারা বললেন, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম আমানতদার। তাই তারা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করলেন। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা গায়েবিভাবে মদদ করেছেন। তাদের সাথে খারাপ কিছু ঘটেনি। তাদেরকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি কিতালের প্রতিও অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছিলেন। কুরআনে এসেছে,

---

৩৬. সুরা আনফাল : ৬৫।
৩৭. সুরা আলে-ইমরান : ১৭৩।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ.

হে নবী, আপনি মুমিনদেরকে কিতালের (যুদ্ধ) প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন।[৩৮]

জিহাদের জন্য মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করুন বলা হয়নি। আল্লাহ তাআলা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন কিতালের কথা। আমি আধুনিকতাবাদীদের উদ্দেশে বলতে চাই, আল্লাহ জিহাদ শব্দ বলেননি, বরং বলেছেন, কিতাল। আর যারা জিহাদ ও কিতালের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে, তাদের জানা থাকা উচিত, জিহাদ কী ও কিতাল কী। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ.

হে নবী, আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে ২০ জন ধৈর্যশীল থাকলে...

বলুন তো, কেন সাহাবিরা আল্লাহই যথেষ্ট বলেছেন? কারণ আল্লাহ কম সংখ্যার কথা বলেছেন। যখন আমরা আয়াত অনুযায়ী শত্রুর সংখ্যার চেয়ে কম হবে, যখন সমগ্র মহাবিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে নামবে, তখন আমাদের মধ্যে যদি ২০ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা ২০০ জনের ওপর বিজয়ী হবে। একজন মুসলিম মানে ১০। একজন মুসলমান ১ লাখ পশুর মুখোমুখি হতে পারে। কারণ আপনি মানুষের মুখোমুখি হচ্ছেন না। তারা সকলেই কাফের। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ছাড়া পশু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ব্যতীত ব্যক্তি পশুর সমতুল্য।

এরপর অবশ্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর আমি জানি তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে।

পূর্ণ আয়াত দুটি নিম্নরূপ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ

---

৩৮. সুরা আনফাল : ৬৫।

يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

হে নবী, মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি ২০ জন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তবে তারা ২০০ জনের ওপর জয়ী হবে। তোমাদের যদি ১০০ জন থাকে, তবে তারা ১ হাজার কাফেরের ওপর জয়ী হবে। কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা বুঝ-সমঝ রাখে না।

এখন আল্লাহ তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং, (এখন বিধান এই যে,) তোমাদের মধ্যে যদি ধৈর্যশীল ১০০ লোক থাকে, তবে তারা ২০০ জনের ওপর জয়ী হবে, আর যদি তোমাদের ১ হাজারজন থাকে, তবে তারা আল্লাহর হুকুমে ২ হাজারজনের ওপর জয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।[৩৯]

এখানে দুর্বলতার অর্থ হলো, ২০০ জনের বিপরীতে ২০ জন।

যাই হোক, যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের সূচনালগ্নে সেনাপতি চার-পাঁচ লাইনের বক্তব্য দিয়ে তাদেরকে শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাদেরকে পিছু না হটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এই অল্পসংখ্যক মুসলিম সেনাবাহিনী কাফেরদের প্রচুর রক্তপাত ঘটায়। আল্লাহ তাআলা পারস্যকে ছিন্নভিন্ন করেন এবং তাদের ধ্বংস করেন। হয়তো এই ৩০ হাজার খুব ক্ষুদ্র একটি সংখ্যা, কিন্তু তাদের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ছিল। সেনাপতি নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি রা. এই যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান। তিনি কাফেরদের রক্তে পা পিছলে পড়ে যান। মাটিতে এত রক্ত ছিল যে, তার উট বা ঘোড়া পিছলে যায় এবং তার পিঠে তির প্রবেশ করে। তিনি সেই ভূখণ্ডে শহিদ হয়ে পড়ে থাকেন, যে ভূখণ্ড তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে মরিয়া ছিলেন।

৩৯. সুরা আনফাল : ৬৫-৬৬

শুধু নুমান শহিদ হননি, সে দেশে আরও প্রচুর সাহাবি শহিদ হয়ে গেছেন। কিন্তু এখন আমরা স্বাধীনভাবে বসবাস করি, অথচ আমরা তা নিয়ে ভাবিও না। আমরা কতজন এ সম্পর্কে চিন্তা করি? প্রতি মুহূর্তে ইরাকে আমাদের ভাইয়েরা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। এই একই ভূমি নুমান ইবনে মুকরিন জয় করেছিলেন। আমরা কয়জন তাদের শাহাদাতের কথা ভাবি? কত নিরীহ মানুষ বিনা কারণে মারা গেছে!

বীর সেনানী উকবা ইবনে নাফে রহ

আসুন, আমরা পারস্য থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলে যাই। আজ আরও একজন বীরপুরুষ সম্পর্কে জানব। তিনি হলেন উকবা ইবনে নাফে রহ.। তিনি মধ্য এশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। লিবিয়া ও মিশরের বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করেছিলেন, যা আজ লিবিয়া ও মিশরের সীমান্তে অবস্থিত। উকবা ইবনে নাফে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের সময়কাল ছিল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির পর। তিনি এমন এক অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন, যিনি বড় হয়েছেন সেসব শুনে শুনে, যেমনটা আজকালকার ফিলিস্তিনি বাচ্চারা শোনে। কাশ্মীরি বাচ্চারা যা শুনতে পায়, ঠিক তেমনই ইরাকি বাচ্চারা যা শুনতে পায়। তিনি বড় হয়েছেন এসব শুনে যে, আমরা তোমাকে হত্যা করব!

ফিলিস্তিনি বাচ্চারা দেখে বোমা মেরে মানুষ হত্যার মহড়া। এতিম ছেলে বলে, আমার বাবা কোথায়? উত্তরে ইহুদিরা তাদের হত্যা করে। ইজরায়েলি সন্ত্রাসীদের তারা প্রশ্ন করে, আমার ভাতিজা কোথায়? উত্তরে শুনতে পায়, হিন্দুরা তাদের জ্বালিয়ে মেরে ফেলেছে। মোদ্দাকথা, এভাবেই তারা বেঁচে থাকে। উকবা ইবনে নাফে এভাবেই বড় হয়েছেন। কিন্তু এই মহানায়কের একটি অনন্যবৈশিষ্ট্যের কারণে আজ আমরা তাকে নিয়ে গল্প বলছি। কী বিষয় তাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল? তার খালাতো ভাই আমর ইবনুল আস রা.। তার মায়ের বোনের একটি পুত্র ছিল এবং সেই পুত্রের নাম মহান সাহাবি আমর ইবনুল আস। আমর ইবনুল আস উকবা ইবনে নাফের মাঝে সম্ভাবনার আলো দেখতে পান। তাই তার সাথে বন্ধুত্ব করেন। তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন, যদিও আমর বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তিনি তাকে সবকিছু শিখিয়েছিলেন। অন্য সাহাবায়ে কেরামের কাহিনি

তাকে শুনিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, উকবাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এই গল্পগুলোর মাঝে নিহিত অনুপ্রেরণা। এই গল্পগুলো শুনে শুনে তিনি নিজের মাঝে চেতনা অনুভব করেন। তিনি এই কিংবদন্তিদের মতো, এই নায়কদের মতো হতে চান। আমর ইবনুল আস রা. এই চেতনাকে কাজে লাগান। তিনি নিজেও একজন বীর, একজন চৌকশ মানুষ ছিলেন, তিনি একজন বাগ্মী বক্তা, একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন। তিনি মিশর জয় করেছিলেন। মিশর অভিযানের প্রাক্কালে তিনি এই যুবককে সঙ্গে নিয়ে যান। মিশর জয়ের পর আমর ইবনুল আস রা. সেখানে শাসক হিসেবে রয়ে যান এবং তিনি উকবাকে মিশর ও লিবিয়ার মধ্যবর্তী এলাকার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু এ দায়িত্ব পেয়ে নিজেকে তিনি মহাশাসক ভেবে বসেননি। বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে নেতৃত্ব ও শাসনভার উপভোগে লেগে যাননি। বরং তিনি মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াতের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। তার দাওয়াতের ফলে আজকের লিবিয়া মুসলমানদের ভূমি। আল্লাহ্ তাআলা তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন উকবা ইবনে নাফে সেই দায়িত্বই পালন করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৪০]

যদিও আল্লাহ্ তাআলা সুসংবাদ এবং সতর্কবার্তা প্রদানের কথা বলেছেন, তারপরও আমরা জিহাদের কথা বলি সেইসব আগ্রাসীদের জন্য, যারা জিহাদ ব্যতীত শিক্ষা নেয় না। কিন্তু দাওয়াতও গুরুত্বপূর্ণ। দাওয়াত মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। হয়তো আমাদের মনে হতে পারে যে, কেন আমরা জিহাদের কথা বাদ দিয়ে তত্ত্বের কথা বলছি। এর উত্তর হলো, কোথাও কোথাও জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোথাও-কোথাও জিহাদের পরিবর্তে দাওয়াত গুরুত্বপূর্ণ। এসব ভূমিতে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। বরং এখানে দাওয়াতের পরিবেশ এতটাই অনুকূল যে, কেউ যদি একাই ১০ জনকে

---

৪০. সুরা আহজাব : ৪৫।

ইসলামের দাওয়াত দেয়, তবে তার পক্ষে ১০ জনকেই ইসলাম গ্রহণ করানো সহজ হয়। কিন্তু আমরা বলি, আমাদের সময় হয়ে ওঠে না, অথচ মাত্র ১০ জনকে দাওয়াত দেওয়া কঠিন কিছু নয়। আমরা চাইলে মিশিগানের এই অংশটুকু পরিবর্তন করে ফেলতে পারি, কিন্তু সমস্যা হলো, এই দায়িত্ব আমরা নিজেদের ওপর অর্পিত করে নিই না। অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।

মুবাশশির (বহুবচন : মুবাশশিরিন) মানে হলো সুসংবাদদাতা। দুর্ভাগ্যবশত আমরা আরব মুসলমানরা খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকদের মুবাশশিরিন বলি। আর সেটা আমাদের অজ্ঞতার কারণে। তারা মুবাশশিরিন নয়। তারাই মানুষকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যায়। তারা কোনোভাবেই মুবাশশিরিন নয়। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মুবাশশির। সে সূত্রে আমরাই মুবাশশিরিন। আমরাই মানুষকে দ্বীন শেখানোর জন্য দাওয়াত ও সুসংবাদের বার্তা নিয়ে যাই। সেইসাথে আল্লাহর রাসুল একজন সতর্ককারী। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদের পাশাপাশি জাহান্নামের আগুনের সতর্কবার্তাও নিয়ে এসেছেন। আল্লাহর নবী দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি আমর ইবনুল আস রা.-কে শিখিয়েছিলেন, আমর উকবাকে শেখান এবং উকবা লিবিয়ায় সে শিক্ষা প্রয়োগ করেছিলেন।

উকবা ইবনে নাফের জীবনী পুরোপুরি জানার আগে আমরা আরেকটি বিষয় জেনে নিই। আমর ইবনুল আস ও উকবা ইবনে নাফে উমর রা.-কে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে কী লেখা ছিল এক পলকে দেখে নেওয়া যাক—

: উমর! আমাদের পুরো লিবিয়া দখলের অনুমতি দিন।

: না। সেখানে অনেক বেশি পরিমাণে ভূখণ্ড রয়েছে এবং তা শাসন করা ও সামলানো কষ্টকর হয়ে যাবে।

: না। আমরা এই ভূমি জোরজবরদস্তি করে দখল করব না। বরং এই ভূখণ্ড ইসলামি দাওয়াতের মাধ্যমে জয় করা সম্ভব হবে।

উকবা ইবনে নাফের নেতৃত্বে মুসলমানগণ সেখানে দাওয়াতি কাজ চালাতে লাগলেন। একের পর এক মানুষ সেখানে ঈমান আনতে লাগল। বিশাল জনগোষ্ঠী একপর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিল। আর তারাই একপর্যায়ে বলল, আমর ইবনুল আস, আসুন। আমরা আমাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব এবং আপনার সাথে থেকে যুদ্ধ করব।

সেখানকার জনগণ ইসলামের ন্যায়বিচার দেখে নিজেদের অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে চেয়েছিল। আজকের লিবিয়া এভাবেই মুসলমানদের হস্তগত হয়। তারপর আমর ইবনুল আস এলে খুব সহজেই সেখানকার নওমুসলিমদের সহায়তায় লিবিয়া জয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু উকবা ইবনে নাফে এতেই সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষান্ত হয়ে যাননি। তার মধ্যকার ইসলামি চেতনা ও অনুপ্রেরণা তাকে সেখানে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে দেয়নি, বরং তিনি আরও এগিয়ে যেতে চান। ইসলামকে আরও ছড়িয়ে দিতে চান। তিনি চান সমগ্র আফ্রিকায় ইসলাম ছড়িয়ে দিতে।

উকবা ইবনে নাফে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একবার তারা আফ্রিকায় যাচ্ছিলেন। আফ্রিকায় তাদের অন্য সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। অন্য বাহিনীকে তিনি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাওয়ার জন্য ভিন্ন একটি পথ ধরেন, যে পথ তাদের কাছে পরিচিত ছিল না। ফলে তারা মরুভূমিতে হারিয়ে যান। তারা মরুভূমিতে আটকা পড়ায় তাদের খাবার আর পানি ফুরিয়ে যায়। বসে বসে তারা মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। এমন সময় উকবা উঠে হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, ইয়া রব, ইয়া রব! আমরা এখানে এসেছি শুধু আপনার জন্য এবং আপনার জন্যই আমাদের এত ত্যাগ। ইয়া রব, আমাদের জন্য বৃষ্টিবর্ষণ করুন।

মহান আল্লাহর কসম! ইতিহাসগ্রন্থে বলা হয়েছে, উকবা ইবনে নাফে এই দোয়ার পর তিনি তার উট বা ঘোড়া থেকে তার পা নামানোর আগেই তার সওয়ারি মাটিতে লাথি মারতে লাগল এবং মরুভূমি থেকে পানি বের হতে থাকল। তারপর তিনি সকলকে উক্ত মাটি খনন করে পানি পান করা এবং গোসল করে নেওয়ার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ এই মরুভূমি থেকে পানির প্রস্রবণ তৈরি করেছেন পান করার এবং গোসল করার জন্য। নিজেদেরকে সতেজ করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা তাদের প্রার্থনা শুনেছেন। কারণ তারা আল্লাহর প্রতি

আন্তরিক ছিলেন। তারা দোয়া শেষ করে হাত নামানোর আগেই মরুভূমিতে পানির প্রস্রবণ তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু এটা উকবার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, যেটার কথা আমরা বলছি। তবে কী সেই বিশেষত্ব? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো বলেননি যে, উকবা সেই ব্যক্তি যার দোয়া কবুল হয়। তিনি অন্যান্য সাহাবি সম্পর্কে বলেছেন বটে, কিন্তু উকবা সম্পর্কে নয়। তিনি এই মুসলিম উম্মাহরই তো একজন ছিলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু এ কথা বলেননি, যে ব্যক্তি কোথাও গিয়ে বক্তৃতা দেয় না, যাকে কেউ চেনে না, তার দোয়া কবুল হবে না। এই কারণেই নবী আ. দোয়া সম্পর্কে হাদিসে বলেছেন,

رُبَّ أشعثَ أغبر مدفوعٍ بالأبواب، لو أقسَمَ على الله لَأَبَرَّهُ.

> এমনও ব্যক্তি আছে, যার চুল আলুথালু, (শরীর, কাপড়) ধূলিমলিন, তার জন্য কোনো দরজা খোলা হয় না, অথচ সে যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তা ঠিকই পূর্ণ করে দেন![৪১]

প্রিয় পাঠক, আপনাদের মনে হতে পারে, হয়তো কেউ আমাকে চেনে না। যে লোকটা নোংরা কাপড় পরে, তার দিকে তাকালে মনে হয় যে, কে এই লোক? এই মানুষটি কে? অথচ এই লোকের দোয়া কবুল হয়। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করুন। আল্লাহর ক্ষমতা অনুধাবন করুন। আমাদের কি মনে হয় যে, আল্লাহ এই পৃথিবীর সুপার পাওয়ারকে ধ্বংস করতে পারবেন না? যদি মনে হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর ওপর আপনার ঈমানকে দুবার পরীক্ষা করুন। যদি সাহাবিদের মতো হাত নামানোর আগে দোয়া কবুল হওয়া চাই, তবে আমাকে-আপনাকে রাতে উঠতে হবে। উকবার মতো করতে হবে। আমার-আপনার হাত নামানোর আগে আমাদেরকে বুঝে ফেলতে হবে যে, আল্লাহ আমাদের দোয়ায় সাড়া দেবেন।

যে হাদিসটি আমরা একটু আগে বলে এসেছি, সে হাদিসটি অনুধাবন করতে হবে। রাতে উঠে নামাজ পড়ে অত্যাচারী ও আগ্রাসীকে ধ্বংস করার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করবেন। মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির রহ. বলেন, তিনি মদিনায় ছিলেন এবং মসজিদে নববিতে নামাজ পড়ছিলেন।

---

৪১. *আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানি*, ৮৬১ (কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ)।

মদিনায় তখন প্রচণ্ড খরা চলছিল। তাই মদিনাবাসী আল্লাহর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করছিল। আমরা তিনবার সালাতুল ইসতেসকা আদায় করেছি, কিন্তু তাতে কোনো ফলপ্রসূ সাড়া পাইনি। আল্লাহ্ আমাদের বৃষ্টি দেননি। সালাতুল ইসতেসকা বৃষ্টির জন্য পড়া হয়। মদিনাবাসী সবাই গিয়ে সালাতুল ইসতেসকা আদায় করল। তিনি বলেন, আমি পেছনে বসে আছি। এমন সময় একজন লোককে দেখলাম, যাকে আগে কখনো দেখিনি। অপরিচিত কেউ একজন। ধূলিমলিন কাপড় পরা। সকলে ভাবছে, কে এই লোকটি? আমি ভাবছিলাম, কিন্তু এই ধূলিমলিন লোকটির কাছে এমন একটি তির (দোয়া) থাকতে পারে, যা আল্লাহর দিকে ছুড়বে আর তিরটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করবে।

হলোও তাই। লোকটি ভেতরে গেলেন। সেখানে বসে শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করছিলেন। তিনি ছিলেন কালো বর্ণের মানুষ। তিনি এমন অবস্থায় মসজিদে নববিতে প্রবেশ করলেন, তার শরীরের ওপরের অংশ ঢেকে রাখার জন্য কিছুই ছিল না। লোকটি মসজিদে নববিতে এসে চারপাশে তাকালেন। সেখানে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে একজায়গায় বসে পড়লেন। আলো না থাকায় তিনি আমাকে দেখতে পাননি। মসজিদে নববির এক কোনায় বসে তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। এরপর দোয়ায় বললেন, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রব, আপনি মদিনাবাসীদের অবস্থা জানেন। তারা সবাই আপনার কাছে এসে দোয়া করেছে, আপনার কাছে বৃষ্টির আর্জি জানিয়ে গেছে। ইয়া আল্লাহ, আমি আপনার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আপনি আমাদের বৃষ্টি দিন। ইয়া রব, আপনি জানেন মদিনাবাসী সারা পৃথিবীর মাঝে খুবই ধার্মিক মানুষ। তারা নবী ও সাহাবিদের বংশধর। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের আকিদাবিশ্বাস ধারণ করে। ইয়া রব, আপনি সবকিছুই জানেন।

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির এই গল্পের বর্ণনাকারী, তিনি বলেন, আরও অনেক আলেম সে সময় মদিনায় ছিলেন। তিনিও তার সময়ের একজন বিখ্যাত আলেম। তিনিও বলছিলেন, এই লোকটা কি পাগল? আমরা সবাই ধার্মিক মানুষ এবং খলিফার সাথে মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। আল্লাহ সাড়া দেননি। আল্লাহ কি এই লোকের দোয়া কবুল করবেন?

ইতিপূর্বে আমরা একটা হাদিসে জেনে এসেছি, ধূলিমলিন কাপড় পরা অপরিচিত এমন লোকও আছে, যার দিকে কেউ তাকায় না ঠিক, কিন্তু তার দোয়া আল্লাহ ঠিকই কবুল করে নেন। এই লোকটি, যে মসজিদে নামাজ

পড়ছিলেন, তার সম্পর্কে কেউ জানে না। রাতে তিনি কী প্রার্থনা করেছেন, তাও কেউ জানে না। যে কালো মানুষটি বিনয়াবনত হয়ে বলছিলেন, ইয়া রব, আপনি জানেন মদিনার লোকেরা এখানে এসেছে এবং আপনি তাদের ডাকে সাড়া দেননি। ইয়া রব, আপনি আমাদের বৃষ্টি দিন। আল্লাহর কসম! তৃতীয়বার বৃষ্টির কথা বলার আগে অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। আল্লাহু আকবার!

একজন কালো মানুষ, অচেনা লোক, আলেমও নন, তার দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তার পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে তিনি তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যান। আর তখনই তিনি এই অচেনা কালো লোকের পরিচয় লাভ করেন। এই লোক ছিলেন মুচি। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির তার পরিচয় উদঘাটনের জন্য তার কাছ থেকে নিজের জুতো ঠিক করে নিলেন। পরদিন তিনি আবার সেখানে গিয়ে তাকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু পেলেন না। তিনি সেখানকার লোকজনকে তার কথা জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে তার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটির কী খবর? সে কোথায়? তারা তার সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারল না। তিনি সেখানে দ্বিতীয়বারের মতো আবার যান। এবার তার সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। লোকটি জানতে চাইলেন, কেন কথা বলতে চান? কথা বলতে চাইলে আগামীকাল আমার কাছে আসবেন। কিন্তু পরের দিন তিনি আবার গিয়ে তাকে আর খুঁজে পেলেন না। লোকটি যেন একেবারে ভ্যানিশ হয়ে গেলেন!

প্রিয় পাঠক, এই অচেনা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু তার ঘটনাটি তার ও আল্লাহর মাঝেই গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কাউকে জানাতে চাননি। তাই তিনি শহর ছেড়ে চলে যান। কেউই জানতে পারল না তিনি কোথায় চলে গেলেন।[৪২]

এমনকি কোনো বিশুদ্ধ সনদেও ওই লোকটির নাম উল্লেখ নেই। অথচ তার দোয়ায় আল্লাহ মদিনায় বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। এমন ব্যক্তি আমি-আপনি-আমরা সকলেই হতে পারব। আমরা যখন এই ব্যক্তির মতো হব তখন আমরা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। এই উম্মাহর এই সমস্যা, দুর্দশা এবং মুসলিম উম্মাহর ফেরাউনদের ক্ষমতালিপ্সুতা বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ বোধ হয় তাদের সর্বোচ্চ

---

৪২. *সিফাতুস সাফওয়া, হিলয়াতুল আওলিয়া।*

ক্ষমতার অধিকারী, বিশ্বাসঘাতক এবং জালেম বানিয়ে দিয়েছেন কারও একটি দোয়ার কারণে। কারণ তাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। আমাদেরকে শুধু আমাদের দোয়ায় অবিচল থাকতে হবে। সেই মানুষটার মতো হতে হবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করবেন। সাহাবিদের মতো হাত তোলার সাথে সাথে কবুল করবেন।

যাই হোক, আমরা উকবা ইবনে নাফের গল্প থেকে আরেক গল্পে চলে এসেছি। তিনি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিলেন, ইয়া আল্লাহ, আমরা তোমার জন্য এসেছি। আর আল্লাহ দোয়া কবুল করে তাদের জন্য বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলেন।

অন্য আরেকটি গল্প শোনাব এবার। তারা আফ্রিকায় পৌঁছে গেলেন। আর আফ্রিকায় রয়েছে বিশাল সবুজ অরণ্য। সেখানে নানান ধরনের হিংস্র পশুপাখি ও জন্তু আছে এবং প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করার জন্য তাদের সেই এলাকাটি স্থিতিশীলভাবে প্রয়োজন ছিল। তার সাথে থাকা লোকেরা ভেতরে যেতে চাচ্ছিল না। উকবা ইবনে নাফে ছিলেন অত্যন্ত খোদাপ্রেমিক এবং মুসতাজাবুদ দাওয়াত, তিনি দোয়া করলে তা কবুল হতো। ভীতিকর স্থানে তিনি অতি বিনয়ের সাথে এসব হিংস্র জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ দূর হয়ে যাওয়ার জন্য বলতেন,

أَيَّتُهَا الْحَيَّاتُ وَالسِّبَاعُ إِنَّا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ارْحَلُوا عَنَّا فَإِنَّا نَازِلُونَ وَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلْنَاهُ.

হে সাপ ও হিংস্র জন্তুকুল, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা, তোমরা আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাও। আমরা এখানে অবতরণ করব। এ ঘোষণার পর যাকে এখানে আমরা পাব তাকে হত্যা করব।

সাহাবিরা তার কর্মকাণ্ড দেখে বললেন, শত্রুরা যদি আজকে দেখে যে, আপনি পশুপাখিদের উদ্দেশে কথা বলছেন, তারা আপনাকে পাগল মানুষ ভাববে, যে কিনা পশুদের সাথে কথা বলছে!

কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে পশুপাখিরাও তার ঘোষণা শ্রবণ করে

প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান পরিবর্তন করে জঙ্গল ছেড়ে চলে গেল।[৪৩] একে বলা হয় কারামত। তারা সুফি নন। এটা নেককার লোকদের জন্য কারামত। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে, তাদের জন্য এটি কারামত। তারা ধার্মিক মানুষ ছিলেন। এই কারামত সাহাবিদের ঈমানকে আরও উজ্জীবিত করেছিল। আজ সারা বিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে। এই কষ্টের সময়ে আমাদের ঈমান বাড়ানোর জন্য কিছু করা প্রয়োজন। দেখুন, আল্লাহ্ তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন। তারা সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ঈমানের স্তর নিচের দিকে। আমাদেরকে আমাদের ঈমান আরও বেশি বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের জীবনেও অলৌকিক ঘটনা দেখা দেবে, যদি আমরা উকবার মতো কাজ করি। আল্লাহ্ আমাদের এখানেও সঠিক পথ দেখাবেন। বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে।

আরেকটি গল্প দেখুন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন খাদেম ছিলেন। তার নাম সাফিনা। তিনি ছিলেন নবীজির দাস। তিনি মুসলমান বাহিনীতে যোগ দিয়ে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে তার দেরি হয়ে যায়। পরে একা একা মরুভূমিতে ঘুরতে থাকেন। মরুভূমিতে নানান ধরনের হিংস্র জন্তু থাকে। কোনো মানুষকে একা পেলে তার ওপরে আক্রমণ করে। কিন্তু সাফিনার ওপর আক্রমণ করেনি। হিংস্র পশু তার কাছে এলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর রাসুলের সেবক। সেই মুসলিম বাহিনী এখন কোথায়?

চিন্তা করে দেখুন! একজনমাত্র লোক মরুভূমিতে হিংস্র পশুর সাথে কথা বলছে এবং তার কাছে জানতে চাইছে, মুসলিম বাহিনী কোথায়? আর পশুও ডানে-বামে মাথা নাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাহিনীর যাত্রা কোন পথে চলছে। সুবহানাল্লাহ। এই ঘটনা সহিহ্ হাদিসে এসেছে। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। পশুটিও তার পেছনে হাঁটতে থাকে যতক্ষণ না তিনি তার গন্তব্যে পৌঁছে যান।

এমন অলৌকিক ঘটনা শুধু সাহাবিদের সাথে সংঘটিত হয়েছে এমন নয়। ষাটের দশকে মিশরে যখন জামাল আবদুল নাসির মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করে সবাইকে জেলে বন্দী করেছিল, সেই অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায় শাইখ কিশের জবানিতে। তিনি বলেন, আমাদের ওপর এত অত্যাচার

---

৪৩. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া।*

করা হয়েছে যে, আমাদের আগে কেউই পৃথিবীতে এমন অত্যাচারিত হয়নি!

জামাল আবদুল নাসির আলেমদের সেলে ক্ষুধার্ত বন্য কুকুর পাঠাত। অথবা কুকুরের খাঁচায় আলেমদের পাঠাত। শাইখ হামিদ কিশ রহ. বলছেন, এসব কুকুর পাঠানোর পর আলেমগণ সিজদায় পড়ে যেতেন। সেখানে কুকুরগুলো শুধু তাদেরকে দেখত, কিন্তু কামড়াত না। উকবার সাথে সেটাই হয়েছিল। সাফিনার সাথে সেটাই হয়েছিল। আর আমাদের সময়ে এই লোকদের সাথেও হয়েছিল। এমন অলৌকিক ঘটনা আমাদের সাথেও ঘটতে পারে। তবে সেটার জন্য আমাদেরকে তাদের মতো কাজ করতে হবে, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর প্রতি অবিচল। তার চেয়েও বড় ঘটনা আবুল আলা হাজরামির সাথে ঘটেছিল। তিনি বাহরাইনে অভিযান পরিচালনাকালে তার সামনে একটি নদী পড়ল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমি কীভাবে নদী পার হব? তখন তিনিও তার পূর্বসূরি উকবার মতো করেন। বলেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে নদী পার করিয়ে দিন। আপনি মরুভূমিতে আমাদেরকে পানি দান করেছেন, আর এখানে আপনি আমাদেরকে পানি থেকে হেফাজত করুন।

এই বলে তারা ঘোড়াসমেত নদীতে নেমে যান। ইতিহাস বর্ণনা করে, নদীর পানি তাদের ঘোড়ার পা পর্যন্ত পৌঁছেনি! এ সকল কারামত শুধু তাদের জন্য বিশেষায়িত নয়, এসব আমাদের সাথেও সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে এই ধার্মিক লোকদের মতো আচরণ করতে হবে। সাহাবা, তাবেয়িন এবং তাদের পরে যারা এসেছে তাদের মতো আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য হতে হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।[৪৪]

খুবাইব ইবনে আদি রা.-কে কুরাইশরা ধরে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়ায়। তারা তাকে

৪৪. সুরা আনআম : ১৬২।

বলেছিল, তুমি নবী সম্পর্কে একটি বাজে কথা বলো, আমরা তোমাকে ছেড়ে দেবো। তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে। তির তার চারপাশে ঘুরছে। তাকে ভয় দেখানোর জন্য নানাজনে নানাকিছু করছে। আর তারা তাকে বলেই চলেছে, আমরা তোমাকে নামিয়ে দেবো, শুধু একটি কথা বলো। তুমি কী চাও? যা চাও তা-ই দেবো।

হ্যাঁ! তিনি বলতে পারতেন। তারা তাকে এও বলেছিল, তুমি কি চাও তোমার নবী তোমার (শাস্তি, সংকটের) অবস্থানে আসুক এবং তুমি স্বাধীন হয়ে ফিরে যাও? কিন্তু তিনি তাদের আশ্চর্যজনকভাবে জবাব দিলেন, নবীজির পায়ের তলায় কাঁটা ঢুকে যাওয়ার চেয়ে আমি যে অবস্থানে আছি সেই অবস্থানে থাকা ভালো।

আল্লাহর রাসুলের জন্য তিনি নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু বিনিময়ে আল্লাহর রাসুলের পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধবে, তাও তিনি মেনে নেননি! শহিদ হওয়ার আগে তিনি দুরাকাত নামাজ আদায় করেন, এরপর তার বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

ولست أبالي حين اقتل مسلما

على أي شق كان في الله مضجعي

وذلك في ذات الإله إن يشأ

يبارك على أوصال شلو ممزع

আমি যখন মুসলমান হিসেবে নিহত হচ্ছি,
তবে আমার নেই কোনো পরোয়া,
যে পার্শ্বেই আমার মৃত্যু হোক,
আল্লাহর জন্যই হবে আমার মরণ।
এই সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বরণ করে নিচ্ছি,
তিনি চাইলে ছিন্নভিন্ন দেহের প্রতিটি টুকরার ওপর—
নাজিল করবেন বরকত।[৪৫]

---

৪৫. *মুহাম্মাদ সাঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, শাইখুল হাদিস মাওলানা তোফাজ্জল হোছাইন রহ.; *সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা*, ডক্টর রাফাত পাশা।

উকবা বিন নাফে শেষ বয়সে জীবনের সফর শেষ করেন। তিনি আনুমানিক ৬০ বছর বয়সে শহিদ হন। নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি রা. সম্পর্কে আমরা প্রথমে বলেছিলাম, তিনিও প্রায় ৬০ বছর বয়সে শহিদ হন।

উকবা দীর্ঘজীবন যাপন করেছেন। তিনি শৈশব থেকে শুরু করে শেষ বয়স পর্যন্ত সমগ্র জীবন যুদ্ধে, দাওয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাটিয়েছেন। উকবা ইবনে নাফে গোটা মরক্কো জয় করে সাগরতীরের বার্লিয়ান নামক স্থানে পৌঁছে অত্যন্ত অনুতাপের সাথে বলেছিলেন,

يا ربِّ، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك أنشر دينكَ المبينَ، رافعًا راية الإسلام فوقَ كل مكانٍ حصينٍ.

হে রব, আমার সামনে যদি এ সাগর বাধা না হতো, তাহলে আমি তোমার পথের মুজাহিদ বেশে দেশের পর দেশ চষে বেড়াতাম, তোমার সুস্পষ্ট দ্বীন ছড়িয়ে দিতাম, ইসলামের পতাকা সকল সুরক্ষিত স্থানেই উড্ডীন করতাম।[৪৬]

আটলান্টিক মহাসাগর প্রতিবন্ধক না হলে উকবা সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ মুসলিম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপও তার বিজয়ের আওতায় নিয়ে আসতেন। ইনতেকালের সময় তিনি তার সন্তানদের উদ্দেশে নসিহত প্রদান করে বলেছিলেন, রাসুলের কোনো হাদিস নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ব্যতীত গ্রহণ করবে না। এবং নেতৃত্ব যেন তোমাদেরকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে না ফেলে।

আল্লাহ তাআলা এই মহান সাহাবিদ্বয়ের প্রেরণা ও চেতনা আমাদের মাঝে সঞ্চার করুন। আমাদের মাঝে দিন তাদের বীরত্বের অনুভূতি। আমাদেরকে তাদের বলে বলীয়ান করুন। আমরাও যেন ইসলামের ঝান্ডা হাতে ছুটে যেতে পারি দিগ্বিদিক। আমিন।

৪৬. *আল-কামিল ফিত-তারিখ।*

দুঃসাহসী সিপাহসালার সাইফুদ্দিন কুতুজ ও কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী

বীর মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ

আমরা এখানে যে কিংবদন্তিদের কথা আলোচনা করি, তা শুধু আলোচনার জন্য নয়। বরং আমাদেরকে তাদের আলোচনা থেকে উপকৃত হতে হবে। আমাদের জীবনে তাদেরকে অনুসৃত বানাতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে, কী এমন গুণাবলি তাদের মধ্যে ছিল, যা তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর মহানায়কে পরিণত করেছে। তাদের জীবনে এগুলো স্রেফ কোনো গল্প নয়, বরং তাতে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। যে গুণাবলি সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি বানিয়েছে, যে গুণাবলি উকবাকে উকবা বানিয়েছে, যে গুণাবলি নুরুদ্দিন জিনকিকে নুরুদ্দিন জিনকি বানিয়েছে, সে গুণাবলিই মুসলিম উম্মাহর ভিত্তি।

আমরা একে অপরকে ঈর্ষা করি। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ঈর্ষা ছিল। কিন্তু তাদের ঈর্ষা ও আমাদের ঈর্ষা এক নয়। সাহাবিদের ঈর্ষা ছিল দ্বীনের বিষয়ে। এই ঈর্ষা ছিল তাদের আত্মমর্যাদাবোধের পরিচায়ক। যেমন একটি ঘটনা বর্ণনা করা যাক—

একবার এক ইহুদি এক মুসলিম নারীকে মদিনার উপকণ্ঠে একা পেয়ে উত্যক্ত করতে লাগল। সে উক্ত মুসলিমাকে নিকাব খুলে মুখ দেখাতে বলল। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর অভিশপ্ত ইহুদি তার পোশাকের উপরিভাগের সাথে মহিলার পোশাকের নিম্নাংশ বেঁধে ফেলে। ফলে যখন মহিলা উঠে দাঁড়ান তখন তিনি অনাবৃতা হয়ে পড়েন। এতে উক্ত নারী চিৎকার করে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন। ঘটনাস্থলে নবীজির এক সাহাবি এসব দেখতে পেয়ে অভিশপ্ত ইহুদিটার গলা কেটে ফেলেন। তা দেখে

উক্ত ইহুদির গোত্রের লোকজন এসে সাহাবিকে হত্যা করে ফেলে। এই ঘটনা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলে সাহাবায়ে কেরাম রা. ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এরপর তিনি একটি সৈন্যদল পাঠিয়ে সেই গোত্রকে ঘিরে ফেলেন। যদি তারা এই বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করত তবে তিনি তাদের ধ্বংস করে দিতেন। এই ছিল সাহাবিদের আত্মমর্যাদা।[৪৭] তারা কিন্তু সাহাবি হত্যার ঘটনা শুনে এ কথা বলেননি, হ্যাঁ, মুখ খোলাই উচিত ছিল। মুখ তো পর্দা নয়। কেন সেই সাহাবি বাধা দেবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বরং তারা ঘটনা শুনেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এটাই আত্মমর্যাদা। এটাই গাইরত, যা সাহাবিদের ছিল। এক নারীর সম্মান রক্ষার্থে তারা সদলবলে বেরিয়েছেন। এই আত্মমর্যাদাই উকবা ও সাহাবিদের গড়ে তুলেছে।

বর্তমানে আমরা টিভি খুললেই ফিলিস্তিনে আমার-আপনার বোনদের ওপর কী চলে তা দেখি। আমরা তা সহ্য করতে পারি না। কিন্তু আমরা হয়ে গেছি পশুর মতো। এমন একটি প্রাণী, যে তার বাবা-মা এবং তার স্ত্রী, বোনদের কাশ্মীর এবং ফিলিস্তিনে নির্যাতিতা হতে দেখে, কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হয় না। অথচ আমরা সেই পুরুষের বংশধর, যে একজন মহিলার পর্দার সম্মানে একটি এলাকা ঘেরাও করেছিল!

ফিলিস্তিনে দিনে কতগুলো চেক পয়েন্টে নগ্ন চেকিং হয়, পরিসংখ্যান দেখলেই জানা যাবে। এ বিষয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো কী বলে, তা দেখলেই বোঝা যাবে ফিলিস্তিনের একটি দিন কতটা মানবেতর। কিন্তু কোথায় গেল পুরুষদের গাইরত? আমরা যখন আমাদের কিংবদন্তিদের গল্প পড়ি, তখন আমাদেরকে তাদের জীবন নিজেদের জীবনের সাথে মেলাতে হবে। আমাদেরকে তাদের সাথে বসবাস করতে হবে। শুধু আনন্দের জন্য তাদের কথা শোনার জন্য হলে হবে না। নারীর ইজ্জত রক্ষার্থে সেনাবাহিনী পাঠানোর কাজ আল্লাহর রাসুলের পরে আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহও করেছেন। তিনিও একইভাবে নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। যদিও তিনি অত্যাচারী শাসক ছিলেন, বহু আলেমকে বন্দী করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম নারীর সম্মানের বিষয়ে ছাড় দেননি। আত্মমর্যাদাবোধ একটি জাতির মূলধন। একবার আমাদের নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ চলে গেলে তার পরে আর কিছুই বাকি থাকে না।

---

৪৭. *সিরাত বিশ্বকোষ*।

তো খলিফা মুতাসিমের আমলে একবার এক রোমান সৈনিক এক মুসলিমা নারীর সাথে অসদাচরণ করেছিল। তখন সেই নারী 'ওয়া মুতাসিমাহ!' (হে মুতাসিম, তুমি কোথায়!) বলে ডাক দিয়েছিল। তা খলিফার কানে পৌঁছলে তিনি এর প্রতিশোধ নিতে খ্রিষ্টানদের পুরো আম্মুরিয়া শহর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

যদিও তিনি ছিলেন অত্যাচারী, কিন্তু যখন মুসলিম মহিলার সম্মানের প্রসঙ্গ এলো, তখন আর বসে রইলেন না। সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি এর প্রতিশোধ নিজ হাতে নিতে চাইলেন। তাকে বলা হয়েছিল, উক্ত মুসলিম মহিলা যখন চিৎকার করে মুতাসিমকে ডাকছিল তখন খ্রিষ্টান সৈনিকটি হেসে হেসে তাকে উপহাস করে বলেছিল, তুমি কি ভাবছ, মুতাসিম তোমার জন্য এখানে আসবে? তখনকার দিনে সাদা-কালো ডোরাকাটা রঙের ঘোড়া ছিল সবচেয়ে দামি ঘোড়া। এই ঘোড়ায় খলিফা চড়তেন। সৈনিকটি উক্ত মহিলাকে উপহাস করে বলছিল, তোমার জন্য সাদা-কালো ঘোড়ায় চড়ে মুতাসিম এতদূর আসবে? তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে?

এই কথা মুতাসিম জানতে পেরে উক্ত নারীকে উদ্ধার করার জন্য সাদা-কালো ডোরাকাটা রঙের ঘোড়ায় চড়িয়ে সম্পূর্ণ একটি বাহিনী পাঠান। তিনি সেখানে পৌঁছে একজন মহিলার সম্মানের জন্য পুরো আম্মুরিয়া ধ্বংস করে ফেলেছিলেন।

এরপর তিনি সেখানকার কারাগারে গেলেন, যেখানে উক্ত নারীকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তিনি কারাগার থেকে তাকে বের করে আনলেন। নিজ হাতে তার হাত-পায়ের শেকল খুলে দিলেন। তখন মহিলা বলল, আপনি কে? খলিফা বললেন, আমিই সেই লোক যাকে তুমি ডেকেছ।[৪৮]

বস্তুত মুতাসিমের মতো ব্যক্তিরাই আমাদের কিংবদন্তি। যদিও তারা অত্যাচারী ছিল। হাজ্জাজ অত্যাচারী ছিল। বড় বড় তাবেয়ির হন্তারক ছিল। কিন্তু যখন কাফেররা মুসলিম ভূখণ্ডের বিষয়ে নাক গলাতে চেয়েছে তখন তিনি বলেছিলেন, আমি আমার লোকদের হত্যা করতে পারি, আমার শহরে যা হয় তা আমার ব্যাপার। কিন্তু তুমি কাফের, বাইরের লোক। তুমি আমার শহরে অনুপ্রবেশ করলে আমি তোমাকে হত্যা করব!

---

৪৮. *তারিখে ইবনে আসাকির।*

আরেকটি মেয়ের ঘটনা প্রচলিত আছে। তা হলো, মুসলমানদের একটি জাহাজ কাফেরদের হাতে পড়ে যায়। তারা জাহাজটি ছিনতাই করে এবং জাহাজে অবস্থানরত এক মুসলিম মেয়ের শ্লীলতাহানি করে। সে সময় মেয়েটি 'ওয়া ইসলামা, ওয়া হাজ্জাজা', অর্থাৎ, 'হে ইসলাম, হে হাজ্জাজ, আমার সাহায্যে আসুন' বলে চিৎকার করে ওঠে। এই সংবাদ হাজ্জাজের কানে পৌঁছলে তিনিও চিৎকার করে ওঠেন এবং অবিলম্বে দরবারে খেলাফতের সাথে যোগাযোগ করেন। হাজ্জাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। স্রেফ একটি মেয়ের শ্লীলতাহানির কারণে তিনি কাফেরদের শহরের পর শহর অতিক্রম করে জাহাজে হামলা চালিয়ে জয়লাভ করেন। অতঃপর মেয়েটির শিকল নিজ হাতে খুলে তাকে মুক্ত করেন। তখন মেয়েটি বলল, আপনি কে? হাজ্জাজ বললেন, লাব্বাইক, লাব্বাইক। অর্থাৎ, আমি হাজির হে বোন!

একজন মহিলার জন্য তিনি এই সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। হাজ্জাজও তাই করেছেন, যা মুতাসিম করেছিল। আর এটাই হলো আত্মমর্যাদা।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একটি ঘটনা বলেছিলাম। তিনি তার খেলাফতের সময় রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। যার ফলে মুসলিম খেলাফতের সীমান্তে কোনো সুসংগঠিত বাহিনী ছিল না। কারণ তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সুসংহত করার দিকেই দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় রোমানদের পক্ষ থেকে তার কাছে একটি চিঠি আসে। যে চিঠিতে রোমান শাসক তার কাছে এই প্রস্তাব দেয় যে, তিনি মুসলিম খেলাফতকে জিজিয়া দেবেন, যেন মুসলিম খেলাফতের সেনাবাহিনীর হাত থেকে তার এলাকা নিরাপদ থাকে। জিজিয়া হলো এমন একটি কর, যা অমুসলিমদের কাছ থেকে তাদের জীবনের নিরাপত্তাস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। খলিফা এই চিঠি পেয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি ছিলেন এমন একজন শাসক, যিনি মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ চাইতেন। মুসলিম উম্মাহর সমস্যাগুলোর সমাধান চিন্তা করতেন। সংস্কার মনোভাব ধারণ করতেন। তাই তিনি একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। তার মনে হলো, যেহেতু মুসলমানদের সেনাবাহিনী এখন সুগঠিত নয় এবং রোমানরাও দুর্বল হয়ে পড়ছে, মুসলমানদের নিরাপত্তা তাদের প্রয়োজন। তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর গ্রহণ করে নিজেদের উন্নয়নে ব্যয় করা যাবে এবং সেনাবাহিনী সুগঠিত করা যাবে। এই ভেবে তিনি চুক্তি

আলোচনা করার জন্য একজন দূত রোমান ভূমিতে প্রেরণ করলেন।

দূত রোমানদের দেশে চলে গেলেন। এরপর যখন তারা সকলে খলিফার দূতকে অভিবাদন জানাচ্ছিল, তখন তার চোখ আশ্চর্যজনক কিছুর ওপর পড়ল। তিনি একজন লোককে দেখলেন গাধার মতো বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। দূত তার কাছে গেলেন। তিনি তার কাছে যাওয়ার পর শুনতে পেলেন, লোকটি বলছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ'। রোমানদের দেশে এটি ছিল বিরল ঘটনা। কারণ তখনও মুসলমানরা কাফেরদের মাঝে বসবাস শুরু করেনি। তো খলিফার দূত দেখলেন, একটি লোক গাধার মতো চক্রাকারে ঘুরছে এবং যখনই সে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দাঁড়ায় তখন তাকে অন্য একটি লোক চাবুক দিয়ে আঘাত করে। সেইসাথে তিনি এও শুনতে পেলেন যে, লোকটি আল্লাহর জিকির করছে। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে তিনি রোমানদের অভিবাদন ও স্বাগতম সব একপাশে রেখে ওই লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

তার কাছে গিয়ে তিনি আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলেন। সালাম শুনে লোকটি ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে উত্তর দিলো। এরপর খলিফার দূত তার কাছে জানতে চাইলেন, সে কীভাবে মুসলিম হয়েছে এবং তার এই অবস্থা কেন। তখন লোকটি বলল, আমি ইসলামের কথা জানতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করেছিলাম। আমার জীবন ভালোই চলছিল। এমন সময় রোমান শাসকের কোনো এক আত্মীয় আমার কন্যাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি আমার বংশধারায় কোনো অমুসলিম থাকুক এটাতে রাজি ছিলাম না। শাসকের আত্মীয় আমাকে প্রস্তাব দেয়, যদি আমার কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিই তাহলে তার অর্ধেক সম্পত্তি আমাকে দান করবে। আমি রাজি হইনি। তখন সে আমাকে বলল, হয় তুমি তোমার কন্যাকে আমার কাছে বিয়ে দিয়ে আমার অর্ধেক সম্পত্তি গ্রহণ করবে, অথবা আমি তোমার চোখ উপড়ে ফেলব এবং তোমাকে গাধা বানিয়ে ছাড়ব। আমি দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলাম।

এ কথা শোনামাত্রই খলিফার দূত রোমানদের অভিবাদন গ্রহণ না করে খলিফার কাছে চলে আসেন এবং তাকে বিস্তারিত ঘটনা জানান। ঘটনা শোনামাত্রই উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. রোমানদের ওপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং তিনি তাদের কাছে চিঠি লিখলেন, ওহে রোমের কুকুর! জেনে রাখো,

তোমাদের সাথে কোনো শান্তিচুক্তি হবে না। তোমরা আমার এক মুসলিম ভাইকে নির্যাতন করেছ। তার সম্মান নষ্ট করেছ। তোমরা যদি অতিসত্বর সেই ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে না দাও তবে আমি তোমাদের ভূমিতে এসে তোমাদের ভূমি দখল করে নেব!

এই চিঠি পেয়ে রোমানরা ভয় পেয়ে গেল এবং তারা লোকটিকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করিয়ে খলিফার কাছে একজন দূতসহ প্রেরণ করল। সেই দূত খলিফার সাথে শান্তিচুক্তি নিয়ে কথা বলতে চাইলে খলিফা বললেন, তোমাদের সাথে কোনো আলোচনা হবে না।[৪৯]

হ্যাঁ, এই ছিল মুসলমানদের আত্মমর্যাদা। আমরা এমন এক সময় পার করে এসেছি, যখন কোনো সাধারণ মুসলমানের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকানোর সাহস পেত না। যদি কেউ কোনো মুসলমানকে অসম্মান করত তবে তা শাসকের কানে পৌঁছা মাত্র তিনি তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এই অবমাননার প্রতিশোধ নিতেন। এরাই ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী শাসক। আমাদের আদর্শ। মহান কিংবদন্তি। শুধু একজন মুসলিম ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করায় খলিফা রোমানদের ভূমি দখল করে নিতে চেয়েছিলেন। অথচ রোমানরা লোকটিকে হত্যাও করেনি। শুধু তার চোখ উপড়ে ফেলেছিল। আর বর্তমানে দেখুন, আমাদের শাসকরা কাফেরদের সাথে শান্তি আলোচনা করে। চুক্তি করে। কিন্তু মুসলমানদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেয় না। যার ফলে আজ সারা পৃথিবীজুড়ে মুসলমানরা মার খাচ্ছে। আমাদের শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনের প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি বাড়িতে আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। আমাদের পুত্র-কন্যাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। অথচ তাদের কোনো বিকার নেই। ইহুদিরা ইয়াসির আরাফাতের সাথে শান্তি আলোচনায় গিয়েছিল। যে বছর তারা শান্তি আলোচনা করেছিল, আলজাজিরার রিপোর্ট মোতাবেক, ফিলিস্তিনিরা সে বছর আরও বেশি নির্যাতন, নিপীড়ন সয়েছে। ইহুদিরা তাদেরকে আরও বেশি হত্যা করেছে। অথচ ইয়াসির আরাফাত ছিল একজন মুসলিম শাসক। কিন্তু সে তার আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে পারেনি, যেভাবে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. পেরেছিলেন। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এটা বলেননি যে—তুমি কেন শান্তি আলোচনা না করে ফিরে এসেছো? সে তো

---

৪৯. *সিরাতু উমর ইবনি আবদিল আজিজ*, ইমাদুদ্দিন খলিল।

চাইলে তার কন্যাকে রোমানদের সাথে বিয়ে দিয়ে অর্ধেক সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারত। তুমি কেন ফিরে এলে?!

কিন্তু খলিফা এ কথা বলেননি। বরং তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাদেরকে রোমের কুকুর সম্বোধন করে চিঠি লিখলেন। দেখুন, একজন মুসলিমের সম্মান তার কাছে কত দামি ছিল!

পাঠক, এই চারটি ঘটনা পরপর উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, আপনাদের মধ্যকার আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা।

হাদিসে বর্ণিত কনস্টান্টিনোপল বিজয়

প্রিয় পাঠক, আমরা আজ আলোচনা করব এমন এক বীরের জীবনী, যার কথা হাদিসে এসেছে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش.

> নিশ্চয় তোমরা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে। এই অভিযানের আমির কতই-না উত্তম আমির এবং সেই সেনাবাহিনীও কতই-না উত্তম সেনাবাহিনী![৫০]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন চৌদ্দশ বছর আগে। মুসলমান যখন আল্লাহর রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে লক্ষ করে, তখন তাদের মধ্যে জোশ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্তমানে আমরা যে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি, তাই যদি এখন আমরা আল্লাহর রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী ও ইতিহাসের পথপরিক্রমায় তার বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করি, তবে আমাদের মধ্যেও উদ্যম ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। কবিতায় আছে—

شباب ذللوا سبل المعالي

---

৫০. *মুসনাদে আহমদ, ১৮৮৫৯।*

وما عرفوا سوى الإسلام دينا

তরুণেরা মর্যাদার পথ পদদলিত করেছে,
ইসলাম ছাড়া মানে না কোনো দ্বীন।[৫১]

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়িন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী যুগ যুগ ধরে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। তারা বর্তমান সময়ের পুরুষদের মতো সংগীতপ্রেমী ছিলেন না, বিকৃত সমকামী ছিলেন না। যার ফলে তাদের পৌরুষ যথাযথভাবেই টিকে ছিল। ফলে তারা ক্ষুদ্রসংখ্যক হয়েও বড় বড় সাম্রাজ্যে আক্রমণের সাহস করেছিলেন। আমাদের মাঝে তাদের সেই শৌর্যবীর্য নেই, আমরা হয়ে পড়েছি সংগীতপ্রেমী পৌরুষহীন পুরুষের দল।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল সম্পর্কে, যা বর্তমানে তুরস্কের রাজধানী। এটি ছিল রোমানদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও অজেয় শহর। যুগে যুগে বহু সম্রাট এই শহর জয়ের চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা সফল হয়নি। তো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করার জন্য উসমান রা. সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু তারা তা জয় করতে সক্ষম হয়নি। তারপরে আমিরে মুআবিয়া রা. তার পুত্র ইয়াজিদকে সেনাপতি বানিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। তারাও সফল হয়নি। তবে মুসলিম উম্মাহ একই সময়ে অন্যান্য শহর জয় করছিল। অন্যান্য দেশে নিজেদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয় করার আকাঙ্ক্ষার পেছনে অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো, রোমানদের নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে সাধারণ জনতাকে রক্ষা করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসা। তা ছাড়া মুসলমানদের খেলাফতকে শক্তিশালী করার জন্য অজেয় শহরটি বিজয় করার প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিকভাবেও শহরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

যদিও এই শহরটি মুসলমানদের হস্তগত হচ্ছিল না, তবে মুসলিম উম্মাহ সর্বাবস্থায় শক্তিশালী ছিল। কারণ তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল। তাদের মধ্যে ঈমানি বল ছিল। যার ফলে যখনই তারা কোনো শহর হারিয়েছে, পুনরায় তা উদ্ধার

---

৫১. হাশেম রিফায়ি।

করে ফেলেছে। হয়তো ফিলিস্তিন আমাদের হাতে না থাকতে পারে, শাম আমাদের হাতে না থাকতে পারে, মিশর আমরা হারিয়ে ফেলতে পারি, কিন্তু যদি মুসলমানদের মধ্যে পূর্বের শৌর্যবীর্য ফিরে আসে, তবে তা উদ্ধার করা সহজ হয়ে যাবে। ঠিক যেমনইভাবে আমাদের পূর্বসূরিরা সে সমস্ত শহর হারিয়ে ফেলার পরেও পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আমর ইবনুল আস রা. ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর হাতে কাফেরদের সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়েছিল। আমরাও যদি তাদের মতো হই তবে আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হব। মুসলিম উম্মাহ এক দেহ এক প্রাণের মতো। তাই সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবেই আমরা আমাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারব। অতীতেও তাই হয়েছে। যখনই আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি, তখনই কাফেররা আমাদের ওপর চেপে বসেছে। কিন্তু যখনই আমরা আমাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছি তারা পিছু হটেছে।

তো যাই হোক, এভাবে একের পর এক খলিফা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে গেছেন। ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার পর খলিফা হারুনুর রশিদও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেউই সফল হননি। তবে কে এই অচেনা শহর বিজয় করেছিল? কার হাতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানীর পতন ঘটে? এই ঘটনা জানতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে কিছুটা পেছনে। আমরা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ঘটনা বিস্তারিত বোঝার জন্য আজ দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করব।

সাইফুদ্দিন কুতুজ

প্রথমজন হলেন সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ.। সাইফুদ্দিন কুতুজের জন্ম হয় হিজরতের ৬৫০ বছর পর। তার আসল নাম মুহাম্মাদ মারমে। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। তাতাররা মিশরে হামলা চালানোর সময় সাইফুদ্দিন কুতুজের মামা ছিলেন মিশরের শাসক। তারা মিশর থেকে অন্যান্য মুসলিম বন্দীর সাথে সাথে কিছু শিশুকেও বন্দি করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে একজন ছিলেন সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ, যাকে তারা ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রি করে দিয়েছিল। বর্তমানে যে-সমস্ত কাফের রাষ্ট্র মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালায়, তারাও একইরূপে মুসলমানদের অঞ্চল থেকে শিশুদের উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং

তাদেরকে কালোবাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ ক্রীতদাস হিসেবে বেড়ে উঠেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে ভালো কিছু রেখেছিলেন। তাই তিনি এমন কাজ করতে পেরেছেন, যা কোনো ক্রীতদাসের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ.-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাকে কেউ একজন এসে বলছে, অচিরেই তুমি মিশরে যাবে এবং তোমার হাতে তাতারদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিশোর বয়সে এই স্বপ্ন দেখে তিনি তার শায়খ ইজজুদ্দিন বিন আবদুস সালাম রহ.-এর কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা খুলে বলেন। ইজজুদ্দিন বিন আবদুস সালাম রহ.-কে সুলতানুল ওলামা বলা হতো। তিনি তার সময়ের সবচেয়ে সাহসী আলেম ছিলেন। তিনি তার সময়ের শাসকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলতেন এবং তাদেরকে তিরস্কার করতেন। তার সাহসিকতা ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের কারণে তাকে সুলতানুল ওলামা বলা হতো। আল্লাহর কসম! এই উম্মত এমন সব ব্যক্তি পেয়েছে, যা অন্য কোনো জাতি পায়নি। তিনি বর্তমান সময়ের শাসকদের লেজুড়বৃত্তি করা আলেমদের মতো ছিলেন না। বর্তমান সময়ের আলেমরা শাসকদের হাতে-পায়ে চুমু খায় এবং তাদের সামনে নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দেয়। তো সাইফুদ্দিন কুতুজ এই মহান আলেমের কাছে গিয়ে নিজের স্বপ্নের কথা খুলে বলেন। সবকিছু শুনে শাইখ তাকে বললেন, আপনি যাকে স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আপনাকে সুসংবাদ দিতে এসেছেন যে, অচিরেই আপনি মিশর থেকে তাতারদেরকে দূর করবেন এবং মোঙ্গলদের হাত থেকে মিশরকে উদ্ধার করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে মিশরের বিজয় দান করুন, যেভাবে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা বিজয় দান করেছেন।

দিন যায়, সাইফুদ্দিন তার স্বপ্ন বুকে ধারণ করতে থাকেন। তিনি তখন মিশর থেকে অনেক দূরে দামেশকে। তিনি ক্রীতদাস। তিনি নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মিশরে বিক্রি হতে চাইছিলেন। যে সময় তিনি মিশরে বিক্রি হওয়ার ইচ্ছা করছিলেন তখনও তিনি নিজের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ রাখতেন না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা দেখুন! সাইফুদ্দিন মিশরেই বিক্রি হলেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পরের কোনো এক শাসকের স্ত্রী তাকে ক্রয় করেন, যিনি পরে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তবে এই নারী শাসক বেশিদিন মিশরের শাসনে ছিলেন না।

কিছুকাল পরেই যুবক সাইফুদ্দিন মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন। যখন তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তাতাররা মিশরে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল।

আইনে জালুতের যুদ্ধ

মুসলিম উম্মাহর ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসতেই সাইফুদ্দিন কুতুজ তা প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হন। মুসলিম উম্মাহর এই দুর্দিনে তিনি বসে থাকতে পারলেন না। তিনি তার মনিবকে হটিয়ে শাসনভার গ্রহণ করেন। সকলেই জানত যে, এই ক্রীতদাসের মাঝেই তাতারদের প্রতিরোধ করার মতো শক্তিসামর্থ্য আছে। তাই সবাই একবাক্যে তার আনুগত্য মেনে নিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, যে ঝড় আসছে তার মোকাবিলা করার সামর্থ্য সাইফুদ্দিন কুতুজের মনিবের নেই। বরং তা আছে সাইফুদ্দিন কুতুজের। তিনি চিরকালের জন্য নেতা হতে যাচ্ছেন না, শুধু এই আক্রমণ থেকে উম্মাহকে বাঁচিয়ে আবার গোলাম হয়ে যাবেন। তিনি ছিলেন কালেমাওয়ালা মুসলমান। তিনি জানতেন একমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমগ্র পৃথিবীর মোকাবিলা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ.

> বলুন, ডাকো তোমরা তোমাদের শরিকদের, এরপর আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, এবং আমায় মোটেও সুযোগ দিয়ো না।[৫২]

সাইফুদ্দিন কুতুজের অন্তরে এই আকিদা ছিল। তিনি কালিমাকে বুকে ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইলেন।

তাতাররা তার কাছে চিঠি পাঠাল। তিনি সমস্ত আলেমকে একত্র করে পরামর্শ চাইলেন, কী করা উচিত? দূত হত্যার অর্থ হলো আসন্ন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা। দূত হত্যা করলে মোঙ্গলরা ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে এবং মুসলিম উম্মাহ নিজেদেরকে রক্ষা করতে প্রাণপণে লড়বে। তখনও মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত ছিল। তাই সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ. দূতকে হত্যা করে

---

৫২. সুরা আরাফ : ১৯৫।

মোঙ্গলদের খেপিয়ে তুললেন। কারণ এর জবাবে মোঙ্গলরা যে ক্ষিপ্র হামলা চালাবে, তার মোকাবিলায় যেন মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়। দূত হত্যার কথা শুনে মোঙ্গলরা এক বিশাল বাহিনী পাঠাল। মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য তারা যে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল তা তাদের কল্পনার চেয়েও বড়। সাইফুদ্দিন কুতুজ সকলকে একত্র করে আসন্ন বিপদের কথা জানালেন। কারণ মোঙ্গলরা আগে থেকেই মুসলমানদের এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত। ফিলিস্তিন তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, শাম তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাথে সাথে মিশরের কিছু অংশও তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারা সেসব অঞ্চলে এক সপ্তাহে ৪০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। সবকিছু মিলিয়ে মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। তারপর সংঘটিত হয় আইনে জালুতের যুদ্ধ।

১২৬০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর (৬৫৮ হিজরি, ২৫ রমজান) গাজার কাছে অবস্থিত আইনে জালুতে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। মামলুক বাহিনী মুখোমুখি হলো কিতবুগার বাহিনীর। উভয় পক্ষেই ছিল প্রায় ২০ হাজারের মতো সৈনিক। এ এলাকা সম্পর্কে মামলুকদের ভালো জ্ঞান ছিল। তাই সুলতান কুতুজ তার অধিকাংশ সৈনিককে পার্বত্য এলাকায় লুকিয়ে রাখলেন। আরেক সেনাপতি বাইবার্সকে অল্পকিছু সৈনিক দিয়ে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে মাঠে নামালেন, যাতে তারা প্রলুব্ধ হয়ে তার ফাঁদে পড়ে। দুই বাহিনীই কয়েক ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করতে লাগল।

বাইবার্স তার সৈন্যদের দিয়ে 'মারো এবং সরে পড়ো' কৌশলে যুদ্ধ করছিলেন। তার এ কৌশল অবলম্বন করার কারণ ছিল, প্রথমত মঙ্গোলদের উত্তেজিত করা আর দ্বিতীয়ত তার অধিকাংশ সৈনিককে অক্ষত রাখা। যখন মঙ্গোলরা একটি বড় আক্রমণ শুরু করল তখন বাইবার্স পিছু হটতে লাগলেন। তিনি মঙ্গোলদের সেই পার্বত্য এলাকায় নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন যেখানে মামলুক সৈন্যরা গাছপালা আর পাহাড়ের আড়ালে ওত পেতে ছিল। বাইবার্স পুরো মঙ্গোল বাহিনীকে মামলুক সৈন্যদের অ্যামবুশের মাঝে নিয়ে এলেন। মঙ্গোল সেনাপতি কিতবুগা বাইবার্সের চাল বুঝতে পারেনি, তাই সে তার সৈন্যদের পলায়নপর বাইবার্সের পেছনে ছুটতে আদেশ দিলো। যখনই মঙ্গোলরা পার্বত্য এলাকার কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখনই মামলুক সৈন্যরা তাদের সামনে আবির্ভূত হলো। মামলুক অশ্বারোহীরা তির ছোড়া শুরু করল। এবার মঙ্গোল সৈন্যরা আবিষ্কার করল যে, মামলুক সৈন্যরা চতুর্দিক থেকেই তাদেরকে ঘিরে রেখেছে।

মঙ্গোলরা এবার খুব ভয়ংকরভাবে আক্রমণ শুরু করল। তাদের আক্রমণে মামলুকদের বাম ব্যূহ প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এবার এ পথ দিয়েই মঙ্গোলরা পালানোর রাস্তা খুঁজতে চেয়েছিল। কিন্তু সুলতান কুতুজ যখন এ অবস্থা দেখলেন, তিনি তার মাথার হেলমেট ছুড়ে ফেলে দিলেন, ফলে তার সৈন্যরা তাকে চিনতে পারল। তিনি তখন তার সৈন্যদের উত্তেজিত করতে সক্ষম হলেন। মামলুক সৈন্যরা এবার যুদ্ধের ময়দানে ভয়ংকররূপে আবির্ভূত হলো। ফলে যুদ্ধের মোড় মামলুকদের দিকে সরে এলো। মঙ্গোল সেনাপতি কিতবুগা নিহত হলো আর পরাজয় বরণ করল মঙ্গোলরা। এভাবে 'তাতারদের পরাজয় অসম্ভব'—এই প্রবাদবাক্য মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

আইনে জালুতের যুদ্ধের পর বাইবার্স সুলতানের পক্ষ হয়ে মঙ্গোলদের তাড়িয়ে দিলেন জেরুজালেম থেকে। জেরুজালেম মামলুকদের অধিকারে এলো। মামলুকরা মঙ্গোলদের বিতাড়িত করল দামেশক এবং আলেপ্পো থেকে। এরপর মঙ্গোলরা আর কখনো এই এলাকায় আসার সাহস দেখায়নি।

তাতাররা আত্ম-অহমিকায় অন্ধ ছিল। তারা ভেবেছিল, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাদের পরাজিত করতে পারবে না। টাইটানিক জাহাজ তৈরি করার পর মেকানিকরাও বলেছিল, এই জাহাজ স্বয়ং ঈশ্বরও ডুবাতে পারবে না! কিন্তু আল্লাহ তা করে দেখালেন। ক্ষুদ্র বরফখণ্ডের সাথে ধাক্কা লেগেই টাইটানিক ডুবে গেল। সুতরাং, শক্তি, ক্ষমতার বাহাদুরি করতে নেই। আল্লাহ এমন শিক্ষা দেবেন, যা কল্পনাই করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা তাতারদেরকেও এমন শিক্ষা দিলেন। আইনে জালুতের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করলেন।

সাইফুদ্দিন কুতুজের মতো একক ব্যক্তির হাতে তাতাররা পরাজিত হলো, যারা এতদিন শহরের পর শহর ধ্বংস করে এসেছিল। যুদ্ধের ময়দানে সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ. 'ওয়া ইসলামা! ওয়া ইসলামা!' বলে চিৎকার করছিলেন। তার এই আওয়াজ মুসলমান যোদ্ধাদেরকে আরও বেশি ক্ষিপ্র করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত তাতাররা ধ্বংস হয়ে গেল। এই যুদ্ধের পর কখনো তাতাররা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ইসলাম আবারও আগের শক্তি ও স্বকীয়তা ফিরে পেল। তখন মামলুকদের রাজত্ব চলছিল। কিন্তু সাইফুদ্দিন কুতুজ কোনো যুদ্ধে নিহত হননি। কাফেররাও তাকে হত্যা করেনি। তিনি নিহত হয়েছিলেন আপন মানুষের হাতে। তার আপন মানুষই তাকে নেতা হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছিল না। তার প্রধান সেনাপতি তাকে সুযোগ বুঝে হত্যা করে ফেলে।

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ

সাইফুদ্দিন কুতুজের আলোচনা আমাদের মূল আলোচনা নয়। আমাদের আলোচনা অন্য বিষয়ে। সাইফুদ্দিন ছিলেন মামলুক সুলতান। মামলুকরা সালতানাত কায়েম করেছিল আইয়ুবিদের পরে। আবার মামলুকদের পরে উত্থান ঘটেছিল উসমানীয় খেলাফতের। উসমানীয় খেলাফত বর্তমান তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা বর্তমান তুর্কিদের মতো ছিল না। সেই খেলাফত মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্ব দিয়েছে। আর বর্তমান তুরস্ক আধুনিকতায় ডুব দিয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষরাই এই উম্মাহকে রক্ষা করেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা বিশাল খেলাফত পরিচালনা করেছেন। সর্বশেষ উসমানীয় সুলতান আবদুল হামিদের কাছে ইহুদিরা এসে বলেছিল, আপনি আমাদেরকে ফিলিস্তিনের কিছু অংশ ছেড়ে দিন। বিনিময়ে আমরা আপনাকে প্রচুর স্বর্ণ দেবো। কিন্তু সুলতান আবদুল হামিদ উত্তরে বলেছিলেন, ধ্বংস হও তোমরা! তোমাদেরকে ফিলিস্তিনের একটি কণাও দেওয়া হবে না। ফিলিস্তিন আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ফিলিস্তিন একজন ভারতীয়, ফিলিস্তিন বা লেবানিজ হিসাবে আমাদের অন্তর্গত নয়। ফিলিস্তিন আমাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি, সাহাবিদের রক্ত যে ভূমিতে ঝরেছিল। এই ভূমি সাহাবায়ে কেরামের বংশধর ও উত্তরসূরি সকলের। ফিলিস্তিন আমরা কেবল সংরক্ষণ করতে পারি, এখান থেকে কোনো অংশ কাউকে দেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই। উসমানি খেলাফত এভাবেই ইসলাম ও মুসলমানদের বহুকাল রক্ষা করে এসেছে। আর সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের ছেলে।

সুলতানের উস্তাদ শামসুদ্দিন সবসময় সুলতান মুহাম্মাদকে হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দিতেন। এই হাদিসটির বয়স তখন ৮৫০ বছর। অর্থাৎ, আল্লাহর রাসুলের এই হাদিস বলার প্রায় ৮০০ বছর পার হয়ে গেছে। খ্রিষ্টানরা ঠাট্টা করে বলত, মুসলমানরা কীভাবে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে। ৮০০ বছর হয়ে গেছে, এখনো তো বিজয় হলো না। কিন্তু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে। এবং বাস্তবায়ন হয়েছিল সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়

ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে কনস্টান্টিনোপল ছিল পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই তা ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগরী। কনস্টান্টিনোপল নগরীর তিন দিকে ছিল সমুদ্র এবং একদিকে স্থল। পশ্চিমে বসফরাস প্রণালি, দক্ষিণে গোল্ডেন হর্ন ও উত্তরে মারমারা উপসাগর। স্থলভাগে ছিল দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এসব কারণে কনস্টান্টিনোপল ছিল এক অজেয় দুর্গ।

কনস্টান্টিনোপল জয়ের জন্য সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্ সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রস্তুতি সমাপ্ত করার পর তিনি অভিযান আরম্ভ করেন। তার স্থলবাহিনী নগরীর পূর্ব দিকে অবস্থান নিল এবং নৌবাহিনীর জাহাজগুলো বসফরাস প্রণালিতে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বসফরাস প্রণালি থেকে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা গোল্ডেন হর্নের মুখ শিকল দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বাইজান্টাইন রণতরিগুলো সেখানে অবস্থান নিয়ে গোলা নিক্ষেপ করছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পরও উসমানি নৌবহর গোল্ডেন হর্ন পদানত করতে সক্ষম হলো না। অন্যদিকে বন্দর সুরক্ষিত থাকায় বাইজান্টাইন বাহিনী তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল পূর্ব দিকে, সুলতানের স্থলবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য। তাই তাদের শক্তিকে বিভক্ত করার জন্য এবং দুই দিক থেকে একযোগে আক্রমণ করার জন্য উসমানি নৌবহরের গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করা ছিল অপরিহার্য। প্রায় দুই সপ্তাহ অবিরাম যুদ্ধের পরও নৌপথে বিজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। অবশেষে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্ এমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে একমাত্র ঘটনা ও বিস্ময়কর হয়ে আছে। উসমানি বাহিনীর সবকটি নৌকা ডাঙায় তুলে পুরো পথে কাঠের পাটাতন বিছানো হলো, তাতে চর্বি মাখিয়ে পিচ্ছিল করা হলো এবং এর ওপর দিয়ে রণতরিগুলো টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। এভাবে টিলা ও পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাতের মধ্যে ৭০টি রণতরি তিনি গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করাতে সক্ষম হলেন।

৭০টি জাহাজের এই মিছিল সারারাত্রি মশালের আলোতে ভ্রমণ করতে থাকে। বাইজান্টাইন সৈন্যরা কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর থেকে বসফরাসের পশ্চিম তীরে মশালের দৌড়াদৌড়ি লক্ষ করে। কিন্তু অন্ধকারের কারণে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। অবশেষে ভোরের আলো যখন রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে,

ততক্ষণে সুলতানের ৭০টি রণতরি ও ভারী তোপখানা গোল্ডেন হর্নের উপরাংশে পৌঁছে গেছে। গোল্ডেন হর্নের মুখে প্রহরারত বাইজান্টাইন নৌসেনারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখল যে, রণতরিগুলো মৃত্যুদূতের মতো তাদের পেছন দিক থেকে ধেয়ে আসছে।

চিত্র : গোল্ডেন হর্ন ও ইস্তাম্বুল

চূড়ান্ত আক্রমণের আগে সুলতান মুহাম্মাদ বাইজান্টাইন সম্রাট কনস্টান্টিনকে নগরী সমর্পণের পয়গাম পাঠালেন এবং নগরবাসীর জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু সম্রাট তা গ্রহণ করলেন না। এবার সুলতান চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, আক্রমণের আগে সুলতান বাহিনীর অধিনায়কদের তলব করে সকল মুজাহিদকে এই পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার আদেশ করলেন

যে, কনস্টান্টিনোপলের বিজয় সম্পন্ন হলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে এবং তার একটি মুজিজা প্রকাশিত হবে। অতএব কারও মাধ্যমে যেন শরিয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘিত না হয়। গির্জা ও উপাসনালয়গুলোর যেন অসম্মান না করা হয়, পাদরি, মহিলা, শিশু এবং অক্ষম লোকদের যেন কোনো ধরনের কষ্ট না দেওয়া হয়।

৮৫৭ হিজরির ২০ জুমাদাল উলার রজনীটি মুজাহিদগণ দোয়া ও ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করেন। ফজরের নামাজের পর সুলতান চূড়ান্ত আক্রমণের আদেশ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ইনশাআল্লাহ, আমরা জোহরের নামাজ আয়া সোফিয়ায় আদায় করব।

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে থাকে। কিন্তু বাইজান্টাইন বাহিনীর অসাধারণ বীরত্বের সামনে একটি মুসলিম সৈন্যও শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। অবশেষে সুলতান তার বিশেষ বাহিনী জেনিসারি বাহিনীকে সাথে করে সেন্ট রোমানুসের ফটকের দিকে অগ্রসর হন। বাহিনীর প্রধান আগা হাসান তার ৩০ জন বীর সঙ্গীকে সাথে করে প্রাচীরের ওপর আরোহণ করেন। হাসান ও তার ১৮ সাথিকে প্রাচীর থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। তারা শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। অবশিষ্ট ১২ জন প্রাচীরের ওপর দৃঢ় অবস্থান নিতে সক্ষম হন। তারপর উসমানি বাহিনীর অন্যান্য দলও একের পর এক প্রাচীরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। এমনইভাবে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরে চন্দ্রখচিত লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়।

বাইজান্টাইন সম্রাট কনস্টান্টিন এতক্ষণ বীরত্বের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছিল। কিন্তু সে তার কিছু অসাধারণ বীরযোদ্ধার সাহস হারানোর পর নিরাশ হয়ে পড়ে। সে উচ্চৈঃস্বরে বলে, এমন কোনো খ্রিষ্টান নেই কি, যে আমাকে খুন করবে?

কিন্তু তার আহ্বানে সাড়া না পেয়ে সে রোমসম্রাটের (কায়সারদের) বিশেষ পোশাক খুলে দূরে নিক্ষেপ করে উসমানি সেনাবাহিনীর উন্মত্ত তরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে সত্যিকার সৈনিকের মতো বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে নিহত হয়ে যায়। তার মৃত্যুতে ১১০০ বছরের বাইজান্টানিয়ান রোম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে, যার সূচনা হয়েছিল প্রথম কনস্টান্টিনের হাতে এবং বিলুপ্তও হলো আরেক কনস্টান্টিনের হাতে। তারপর থেকে কায়সায় উপাধিই ইতিহাসের উপাখ্যানে পরিণত হলো।

জোহরের সময় সুলতান মুহাম্মাদ বিজয়ীর বেশে কনস্টান্টিনোপল নগরীতে প্রবেশ করেন। খ্রিষ্টীয় তারিখ হিসাবে দিনটি ছিল ২৯ মে ১৪৫৩ সাল। সুলতান ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সিজদায় পড়ে গেলেন। মুসলিম বাহিনী জোহরের নামাজ আয়া সোফিয়ায় আদায় করল।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ শহরের অধিবাসীদের জানমালের নিরাপত্তাবিধান করেন এবং তাদেরকে তাদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করেন।

১৬ মুহাররম ৮৫৫ হিজরি মোতাবেক ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মাদ উসমানি সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর, কিন্তু অসম সাহস, অতুলনীয় প্রজ্ঞা, নিপুণ রণকৌশল ও গভীর ঈমানি জজবায় অল্প সময়েই তিনি তার পূর্বসূরিদের ছাড়িয়ে যান। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর সালতানাত পরিচালনা করেন। তার শাসনামলে যেমন ইসলামের বিজয়াভিযানে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল, তেমনই সকল শ্রেণির ও ধর্মের মানুষ ন্যায়বিচার, জানমালের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ইসলামি শাসনব্যবস্থার সুফল। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের শাসনামল বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তবে যা তাকে উম্মাহর হৃদয়ে অমর করে রেখেছে তা হলো কনস্টান্টিনোপল বিজয়।

মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল বিজয় করে আয়া সোফিয়াকে মসজিদে পরিণত করেন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এই মসজিদকে জাদুঘরে পরিণত করে। তবে এটা মসজিদ হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। এই বিশ্বাসঘাতক তার পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল উসমানীয় খেলাফতের গৌরব। তাই সে মসজিদকে জাদুঘরে পরিণত করেছিল। এই ভূমি সেই ভূমি, যেখানে শায়িত আছেন প্রখ্যাত সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রা.।

আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর ইনতেকাল

সুলতান মুহাম্মাদকে 'ফাতিহ' (বিজেতা) বলা হয়। কারণ তিনি হাদিসে বর্ণিত বিজেতা ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারই বিজয় করা তুরস্কে মুসলমানরা

নির্যাতিত হয়। ইসলামকে দাফন করার চেষ্টা হয়েছে। তিনি বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনারও বিজয়ী ছিলেন, যেখানে একসময় ৩০ হাজার বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে আরও অনেক অঞ্চল জয় করতে থাকলেন। হাজার হাজার মসজিদ নির্মাণ করলেন। শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি তার সঙ্গীসাথিদের বলতেন, আমার ওপর নির্ভর করবে না, আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। আমরা আল্লাহর সাহায্যেই যুদ্ধে জয়ী হই।

উমর রা.-ও বলতেন, আমাদের শত্রুরা শক্তিসামর্থ্যে, আর্থিক দিক থেকে এগিয়ে। কিন্তু আমরা আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর ভয় আমাদের মধ্যে না থাকলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমরা আল্লাহর সাহায্যেই জয়লাভ করি।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশ

মুসলমানদের ওপর বহু ঝড়ঝাপটা এসেছে। কিন্তু মুসলমানরা সর্বাবস্থায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পুনরায় জেগে উঠেছে। এমনও সময় এসেছিল, যখন কারামিতা সম্প্রদায়ের লোকেরা কাবাঘরের হাজরে আসওয়াদ পাথরও খুলে নিয়েছিল। মুসলমানদের রক্তে পা ডুবিয়ে বলেছিল, আমিই আল্লাহ! আমার ক্রোধ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। কিন্তু এরপরেও একদিন মুসলিম উম্মাহ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই মনে করে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য হবে না। আল্লাহর রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে না। কিন্তু আল্লাহর কসম! তা সত্য হবেই। মুসলমানরা রোম বিজয় করবেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।[৫৩]

পুরো আয়াতে বলেছেন,

---

৫৩. সুরা নুর : ৫৫।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে জমিনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.

আর আমি ইচ্ছে করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে।[৫৪]

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা! রাসুলের কোনো বক্তব্য নয়। এটি হাদিসের চেয়েও শক্তিশালী। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তোমরা যারা আল্লাহকে ভয় করো, তারা আল্লাহর হুকুম অনুসরণ করবে, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। মন্দ কাজ, বাজে কথাবার্তা, ব্যভিচারসহ সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকবে। এভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের ওপর অবিচল থাকে আল্লাহ তাদেরকে জমিনের খেলাফত দান করবেন। আল্লাহ আরও বলেছেন, হে দুর্বল লোকেরা, যখন তোমরা ইসলামে ফিরে আসবে, যখন তোমরা ইসলামে অটল থাকবে, তখন আমি তোমাদেরকে ইমাম বানাব। ইমাম মানে এখানে নামাজের ইমাম নয়, ইমাম মানে বিশ্বের নেতা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যখন দেখবে মুসলিম উম্মাহ অন্ধকার পথ পাড়ি দিচ্ছে, তখন সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে তাকাও। একটি আলো দেখতে পাবে। এই আলোই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে

৫৪. সুরা কাসাস : ৫।

ইসলাম পৌঁছে যাওয়ার ওয়াদা করেছেন। বড় বড় অট্টালিকাসমৃদ্ধ শহর থেকে পাতার তৈরি ঘরময় শহর সর্বত্র ইসলামের জয়জয়কার শুরু হয়ে যাবে। সেটা কারও পছন্দ হোক বা না হোক। যারা ইসলামের সাথে থাকবে, তারা সফল হবে। যারা থাকবে না, ইসলাম তাদেরকে ছাড়াই জয়লাভ করবে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য হাদিসে বলেছেন, এই উম্মাহ বিজয়ী হবে। কিন্তু আমাদেরকে বিজয়ী হওয়ার ভূমিকা পালন করতে হবে, আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে, ইলম শিখতে হবে। আমাদের আলোচিত এই মহানায়কেরা ইলম দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। আজ আমরা বীরশূন্য মুসলিম উম্মাহ। কেন আমাদের মাঝে এ জাতীয় পুরুষ নেই? কারণ আমরা ইসলামের বীরদের সম্পর্কে জানি না। এই উম্মতের অধিকাংশই তাদের কথা জানে না। আমাদের আদর্শ হয়ে গেছে খেলোয়াড়, মডেল, সমকামীরাই। আমাদের যুবকরা তাদেরকে দেখতে চায়, তাদের মতো হতে চায়। কারণ তারা যাকে দেখে, তার ব্যাপারেই জানার চেষ্টা করে। যদি তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর এবং উসমান রা., তাদের বংশধর, চার ইমাম, নুরুদ্দিন জিনকি, সালাহুদ্দিন সম্পর্কে জানত, তবে তারা তাদের মতো হতে চাইত। এই কারণেই আমাদেরকে তাদের জীবনী আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন এখানকার যুবক ভাইদের মতো। যদি তাদের আলোচনা দিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করি এবং জাগ্রত করি, তবে আমরা জয়ী হব। তাই আমাদেরকে ইলম শিখতে হবে। যাদের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি তারা দামেশক থেকে মিশরে, মিশর থেকে বসরা এবং বসরা থেকে সমরকন্দে গিয়েছিলেন স্রেফ একটা হাদিস শিখতে। অথচ আমরা মুসলমান হয়ে দ্বীনি ইলমের জন্য পাঁচ-দশ মিনিট সময়ও ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমরা আরবি শিখতে প্রস্তুত নই। অথচ কুরআন-সুন্নাহর ভাষা আরবি। আমরা দ্বীন সম্পর্কে জানতে ইংরেজি বইপত্র পড়ি। কিন্তু আরবি জানলে আরবি কিতাবাদি পড়তাম।

প্রিয় পাঠক, আমাদের এমন লোক দরকার, যারা আকিদার প্রতি কঠোর হতে পারে। তেমনই একজন হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.। আমরা তার সম্পর্কে জেনেছি। তার মতো হতে হলে আমাদেরকে তাওহিদ, আকিদা এবং ফিকহ শিখতে হবে।

মুসলিম উম্মাহ বিজয়ী হওয়ার জন্য আপনার দ্বিতীয় গুণ হলো, ইবাদতে

মনোনিবেশ করা। তাহাজ্জুদগুজার হতে হবে। বিশ্বের সমস্ত দেশে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের সাহায্য ও মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। আফগানিস্তানে আমাদের ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। ফিলিস্তিনে, কাশ্মীরে এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের সাথে যা চলছে, তার জন্য কাঁদতে হবে। আমরা এটা ভাবব না যে, আমাদের দোয়া বৃথা যাচ্ছে। যখনই এই উম্মতের জন্য দোয়া করব আল্লাহ কবুল করবেনই। আল্লাহ ফিরিশতা দিয়ে সাহায্য করবেন।

সুতরাং, আমরা আমাদের কলব এবং আমাদের ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করব। তবেই আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করবেন। আমাদের মধ্য থেকেই সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ ও মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ তৈরি করে দেবেন। আল্লাহ তাদের উভয়ের ওপর রহম করুন। আমিন।

সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া-বিহামদিকা ওয়া-আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া-আতুবু ইলাইক।

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তার পিতা শাইখ মুসা জিবরিল রহ. ছিলেন মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল শৈশবের বেশ কিছু সময় কাটান মদিনায়। সেখানেই ১১ বছর বয়সে তিনি হিফজ সম্পন্ন করেন। হাইস্কুল পাশ করার আগেই তিনি *বুখারি* ও *মুসলিম শরিফ* মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন।

পরে তিনি *বুখারি* ও *মুসলিম শরিফের* সনদসমূহ মুখস্থ করেন, আর এরপর হাদিসের ছয়টি কিতাব (কুতুব সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। এরপর তিনিও তার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়ার ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রহ.-এর তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তার কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাজকিয়াও লাভ করেন।

শাইখ বকর আবু যাইদ রহ.-এর সাথে একান্ত ক্লাসে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কিছু বইও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শিনকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামা হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাজকিয়া লাভ করেন।

তিনি তার পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়েছেন। শাইখ মুসা জিবরিল (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের পিতা) শাইখ ইহসানকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান আমেরিকায় কিশোর শাইখ

আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হওয়ার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইনশাআল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন!

তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে!

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল *আর-রাহিকুল মাখতুমের* লেখক সাফিউর রহমান মুবারকপুরি রহ.-এর অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আবদুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াস সালিমের অধীনে। তাদের মধ্যে শাইখ আতিয়াস সালিম ছিলেন শাইখুল আল্লামা মুহাম্মাদ আল-আমিন শানকিতি রহ.-এর প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ শানকিতির ইনতেকালের পর তার প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *আদওয়াউল বায়ানের* কাজ শেষ করেন।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবরাহিম আল-হুসাইনের ছাত্র ছিলেন। শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ রহ.-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। শাইখ আবদুল্লাহ আল-কুদের (আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুতুল ইলমিয়্যা ওয়াল-ইফতা—Permanent Committee for Islamic Research and Issuing Fatwas-এর প্রথম দিকের সদস্য) সাথে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হজ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল-হুসাইনের অধীনেও অধ্যয়নের সুযোগ পান।

তিনি মহান মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল-আনসারি রহ.-এর অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তার কাছ থেকে তাজকিয়া লাভ করেন। তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরার অধীনে। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানি রহ.-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আলবানি তার অসিয়তে শাইখ আবু মালিককে তার জানাজার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল-কারনিরও (রাবিল মাদখালির জামাতা) ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাজতপ্রাপ্ত হন শাইখ

মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যদের কাছ থেকে। শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য শাইখ বিন বাজ আমেরিকায় থাকা সৌদি ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাজের কাছ থেকে তাজকিয়া অর্জন করেন (শাইখ বিন বাজের মৃত্যুর তিন মাস আগে)।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বাজ তাকে সম্বোধন করেন একজন 'শাইখ' হিসেবে এবং বলেন, তিনি '(আলেমদের কাছে) পরিচিত' ও 'উত্তম আকিদা পোষণ করেন'।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল নিজেকে শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবি রহ., শাইখ আলি আল-খুদাইর, শাইখ নাসির আল-ফাহাদ, শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ানসহ ওইসব আলেমের সিলসিলার অনুসারী মনে করেন, যারা বর্তমান সময়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ও উলামায়ে নজদের শিক্ষাকে সত্যিকারভাবে আঁকড়ে আছে, যারা প্রকৃত অর্থে উলামায়ে নজদের উত্তরসূরি।

তার সব শিক্ষকের মাঝে শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবি রহ.-কে তিনি তার প্রধান শাইখ মনে করেন এবং শাইখ হামুদের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ মন্তব্য করেন, (তিনি হলেন) আমাদের সময়ে তাওহিদের ইমাম।[৫৫]

৫৫. তথ্যসূত্র—দারুল ইলম ওয়েবসাইট

অনুবাদক পরিচিতি

মানুষের কি আদৌ কোনো পরিচয় আছে বলার মতো?
তবুও বলতে হয় বলে বলা...

আমি আম্মারুল হক। আমার জন্ম হয়েছে ১৯৯৯ সালের ৫ মের এক ফরসা ভোরে। জন্মের সময় কঠিন নিউমোনিয়া হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল, এই বুঝি মরে গেল ছেলেটা। কিন্তু আল্লাহর দয়ায় বেঁচে গেলাম। সে যাই হোক, জন্ম ও বেড়ে ওঠা দুটোই চট্টগ্রামে। পড়াশোনার হাতেখড়ি হয় মায়ের কাছে কুরআন পড়ে। এরপর মা'আজ বিন জবল একাডেমিতে ক্লাস ফাইভ অবধি পড়ে হিফজ করলাম আলী বিন আবি তালিব হিফজ একাডেমিতে। কওমি ধারার পড়াশোনা শুরু হয় চট্টগ্রামের বাইতুস সালাম মাদরাসা থেকে। এখান থেকে পড়ে চলে যাই আল জামিআতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায়। কওমি মাদরাসার পড়শোনার ইতি এখানেই টানা হলো।

স্কুলকলেজেও পড়েছি পাশাপাশি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদে অনার্সে অধ্যয়নরত আছি। এই আর কি...